সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বৃষ্টি নামার পরে

এই গল্প-সংকলনে ১৪টি গল্পের মধ্যে বিশেষ করে নারীজাতির সামাজিক যন্ত্রণা ও সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়-আলোড়িত ভিন্ন স্বাদের এই গল্প গুলিতে কিশোর-কিশোরীদের অন্তরের উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে নানান ছলনা, বিভিন্ন অভাব অভিযোগ এবং নানা জটিলতার দিকগুলিও তাঁর কলমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আধুনিক জীবনের আত্মসর্বস্বতা, পরশ্রীকাতরতা, সামাজিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ও অলীক স্বপ্নের পিছনে মানুষের মিথ্যে ছুটে যাওয়ার প্রতিচ্ছবি এই গল্পগুলি।

বৃষ্টি নামার পরে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

লা ল মা টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

ইভাদি ও জামাইবাবুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রথিতযশা মহিলা সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য নারীজাতির সামাজিক যন্ত্রণা, সাংসারিক সুখদুঃখ উপলব্ধি করে তার বর্ণনায় অতিশয় দক্ষতা ও পারংগমতা দেখিয়েছেন। হৃদয় আলোড়িত এই গল্পগুলিতে কিশোর-কিশোরীদের অন্তরের উপলব্ধির কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সুখদুঃখ, মনের বাসনা, অভাব অভিযোগ ও নানা জটিলতার দিকও তাঁর গল্পের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা ভাবলে, তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়স্বরূপ লেখিকার গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

বৃষ্টি নামার পরে	...	১১
ফিরে দেখা	...	২২
হিম চাঁদের আলো	...	৪০
গ্রন্থি	...	৪৫
ঝিনুক খোঁজার বেলায়	...	৫৮
উনিশ বছর বয়স	...	৭০
শাড়ি, রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী	...	৮৪
পঁচিশ বছর পরে	...	৯৫
লাল গোলাপ	...	১১৫
ভাইরাস	...	১৩০
মোহনায় এসে	...	১৩৭
উপক্রমণিকা	...	১৪৮
মনের মধ্যে মন	...	১৫৪
এপার ওপার	...	১৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি নামার পরে

মিনিবাস থেকে নামতেই কাঁধের ব্যাগে সুরেলা ধ্বনি। চেন খুলে মোবাইল ফোনটা বের করল ঝুমুর। যা ভেবেছে তাই। রাহুল। উফ, কলেজে ঢোকার মুখে ওই নাছোড় ছেলেটার প্যানপ্যানানি শুনতে হবে এখন?.

কাল রাত থেকে খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজ আরও তেতো হয়ে গেল ঝুমুরের। ফুটপাথে উঠে বোতাম টিপে খুদে যন্ত্রটা চাপল কানে। নীরস গলায় বলল— হ্যাঁ বল।

—কী করছিস তুই আজ?

—কিঁউ?

—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বোর করিস না। এখন পরপর তিনটে ক্লাস। বিজি থাকব।

—বিকেলে একবার মিট করতে পারবি?

—জানি না।

বলেই ঝুমুর নিথর করে দিল ফোনটাকে। কলেজে ঢোকার আগে রোজই সুইচ অফ করে, আজ আরও আগে করলে ভালো হত।

নিমপাতা খাওয়া মুখে কলেজ গেটের দিকে এগোল ঝুমুর। সত্যি, পারেও বটে রাহুলটা! মেডিকেলের ফোর্থ ইয়ার চলছে, কোথায় এখন ঘাড় গুঁজে বই-এর অক্ষর চাটবি, তা নয়, খালি উড়ু-উড়ু ভাব। গত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর ঝুমুরদের কলেজে ডিবেট কম্পিটিশনে এসেছিল রাহুল। কালচারাল কমিটিতে থাকার সূত্রে তখনই ঝুমুরের সঙ্গে আলাপ। তারপর থেকে বিলকুল ফেভিকল হয়ে সেঁটে আছে। হুটহাট হানা মারছে ঝুমুরদের কলেজে। আর ফোন তো যখন-তখন। রাত বারোটায়, ভোর ছ-টায়। সারাক্ষণ এক ক্যাসেট, ভালো লাগে না রে ঝুমুর, কিছু ভালো লাগে না। আরে, তোর কিছু ভালো না-লাগলে ঝুমুর কী করবে? তোমার সঙ্গটি ঝুমুরের মন্দ লাগে না, তাই ঝুমুর তোমায় পাত্তা দেয়। তা বলে মনে মনে কিছু এঁচে নিয়ে ঝুমুরের সঙ্গে যদি চাঁদ-তারার ছক কষে থাকো, তবে সে গুড়ে কেজি-কেজি বালি। ইশ্‌ক বস্তুটি যে কী খতরনাক, ঝুমুর হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে। বাড়িতে একজোড়া স্যাম্পেল রয়েছে না? তাদের দেখছে না রাতদিন?

কথাটা মনে হতেই ঝুমুরের বুকের ভিতর দিয়ে একটা শিরশিরে বাতাস বয়ে গেল। আজ সেই জুটির বাইশতম বিবাহবার্ষিকী। অথচ সকাল থেকে একবারও উইশ করেনি ঝুমুর। প্রবৃত্তি হয়নি। কাদের শুভেচ্ছা জানাবে? দুই লড়ুয়ে মোরগ-মোরগাকে? কী বলবে? দিনটা বার বার ফিরে আসুক, তোমরা প্রাণ ভরে ছুরিতে শান দাও। পরস্পরের ফাঁকফোকর খোঁজাই যাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তুচ্ছ কারণে যারা আঁচড়াআঁচড়ি করছে সারাক্ষণ, তাদের আবার বিবাহবার্ষিকী! ফুঃ!

নাহ্, ওদের কথা আর ভাববেই না সারাদিন। কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকে ঝুমুর এক ঝলক দেখল আকাশটাকে। মাথার উপর ঘন শ্রাবণ। থইথই করছে পাঁশুটে মেঘ। সবে সাড়ে এগারোটা বাজে, এর মধ্যেই কেমন ম্লান হয়ে গেছে চারিদিক। প্রকৃতিও কি বুঝে ফেলেছে ঝুমুরের আজ মন ভালো নেই?

কলেজে এসে অবশ্য মুখ ভেটকে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আওয়াজ মেরে মেরে জিনা হারাম করে দেবে বন্ধুরা। অলস ভঙ্গিমা বদলে ঝুমুর হাঁটার গতি বাড়াল। সিঁড়ি টপকে মেন বিল্ডিংয়ের লম্বা টানা করিডোর পৌঁছে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল চটপট। চলতে চলতে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবে একবার পরখ করল ব্যাগটাকে। যাক বাবা, ফোল্ডিং ছাতাখানা আছে। কালকের মতো বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না।

অনার্সের পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। ডায়াসে এস কে এম, রোল কল শেষ, হাতে অতি পরিচিত সেই হলুদ ঠোঙা। আদ্যিকালের নোট নিষ্প্রাণ স্বরে পড়ে চলেছেন স্যার। টুঁ শব্দটি না-করে পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ল ঝুমুর। খাতা খুলে চেষ্টা করল নোট লেখার। দু-চার মিনিটেই ধৈর্য খতম, আনমনা হয়ে যাচ্ছে চোখ-কান। কাল রাতেও কী বিশ্রী একটা ধুন্ধুমার বাধাল দু-জনে! পারেও বটে! এদিকে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, অথচ সন্ধেবেলা দু-জনে দু-জনের জন্য উপহার এনেছে ঘটা করে! হাইট অফ ভণিতা আর কাকে বলে!

ক্লাসরুম মুছে যাচ্ছে চোখ থেকে। ঝুমুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল কালকের সন্ধেটাকে। জলদি জলদি বাড়ি ফিরে এসেছে ফুয়েরার, হার হাইনেসের মেজাজও কুলপিমালাই। স্বহস্তে দুধ-কফি বানাল মা, বোতল না-খুলে বসে বাবাও চুমুক দিচ্ছে কফিতে, টিভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে দিব্যি টিপ্পনি চলছে টুকটাক। উপহার দেওয়া নেওয়া করে দু-জনের মুখেই বেশ খুশি-খুশি ভাব। এমন সুখের দৃশ্য বাড়িতে একেবারেই দেখা যায় না তা নয়। তবু ঝুমুরের কেমন কেমন লাগছিল। এত ভাব টিকলে হয়!

হলও তাই। সবে বেডসুইচ নিভিয়ে চোখের পাতাটি বুজেছে ঝুমুর, পাশের বেডরুমে যুদ্ধের দামামা। প্রথমে চাপা সুরে, ক্রমশ চড়ছে পর্দা। হঠাৎ আমার জন্য টাই কিনতে গেলে কেন? তাও আবার ও-রকম ঝিনচ্যাক কালারের? রংচঙে ড্রেস তুমি পর না বুঝি? টাইটা ঝুলিয়ে নয় আরও খোকা সেজো।

—বটেই তো! খুকির বরকে তো খোকা সাজতেই হয়!

—কী? কী বললে? আমি খুকিপনা করি, অ্যাঁ?

—রাতদুপুরে ফ্যাচ-ফ্যাচ কোরো না তো, শান্তিতে শুতে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পুট করে একটা হুল ফুটিয়ে ভোঁস-ভোঁস নাক ডাকাবে, সেটি তো চলবে না। বলতে হবে কী খুকিপনা করেছি! নইলে... নইলে...

—নইলে কী?

—তোমার সোহাগ দেখিয়ে কিনে আনা রিস্টওয়াচ ডাস্টবিনে ফেলে দেব।

—দিতেই পার। এ তো আর সমীরণ ঘোষের উপহার নয় যে, বুকে জড়িয়ে রাখবে!

—ইতর! ইতর! সন্দেহ করেই গেল। তুমি সমীরণের পায়ের নখের যুগ্যি নয়, বুঝেছ?

—ঠিকই তো। পরের বউয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করার আর্ট তো আমি শিখিনি।

—আহা, মরে যাই! বেড়াল বলে, মাছ কীভাবে খাব গো! তুমি যে কী চিজ তা কি আমার অজানা? গত মাসে কাকে নিয়ে তুমি বকখালিতে গেছিলে, অ্যাঁ? অফিস টুরের নামে কোথায় কখন ফুর্তি মেরে আসো, টের পাই না ভেবেছ?

—দেখো, নিজেই দেখো সন্দেহবাতিকটা কার। আমার পিছনে টিকটিকিগিরি না-করে নিজের ছেনালপনাটা আগে বন্ধ করো। ভুলে যেও না, ঝুমুর বড়ো হয়ে গেছে। কোথায় কখন কার সঙ্গে আশনাই করে বেড়াও মেয়ে সব টের পায়।

—মেয়ে তার ডিবচ বাপকেও চেনে। তুমি যে কোন নর্দমার কীট...

এরপর বিশুদ্ধ স্ল্যাং। ভাষা বস্তির, মাধ্যমটা শুধু ইংরেজি। চোখা চোখা বিশেষণগুলো শুনে বিশ্বাস করা শক্ত এঁরা একসময়ে পরস্পরের প্রেমে ফিদা ছিলেন!

কবে থেকে মা-বাবার সম্পর্কটা এত বিষাক্ত হয়ে গেল? কেন হল? সমীরণকাকুর সঙ্গে সত্যিই কি মা-র কোনো অ্যাফেয়ার আছে? ঝুমুরের তো বিশ্বাস হয় না। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে সমীরণকাকুকে দেখছে, বাবারই বন্ধু, দরকারে অদরকারে ডাকলেই ঝুমুরদের পাশে আছে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট ভালো লোক! রগুড়ে, উইটি গলা ছেড়ে হাসতে পারে। বাবার চেয়েও মা-র সঙ্গে সমীরণকাকুর বেশি র‍্যাপো, তাই কি বাবা হিংসেয় জ্বলে? বাবাকেও কি আদৌ লম্পট, চরিত্রহীন বলে ভাবা যায়? অফিস অফিস করে একটু বেশি ব্যস্ত থাকে বাবা, কোম্পানি নাকে দড়ি দিয়ে ছোটায় অনবরত। টেনশনে টেনশনে বাবার তো সুগার ধরে গেল। বউ মেয়েকে অঢেল সময় দিতে পারে না বলেই বাবা ভিলেন? যত্রতত্র লটঘট করে বেড়াচ্ছে? কী আজগুবি ধারণা! আর যদি দু-জনের সন্দেহই ঠিক হয়, তাহলে তো ধরতে হবে কোথাও একটা ফাঁকা জায়গা ছিলই, সম্পর্কের মাঝে। একটু একটু করে বড়ো হয়েছে ফাটলটা। এবং প্রকৃতি তো শূন্যস্থান রাখে না, কেউ-না-কেউ সেখানে ঢুকে পড়বেই।

ঝুমুরের আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা-মা এখনও একসঙ্গে থাকে কেন? রোজ রোজ একে অপরকে ছোবল মারার চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াই তো ভালো। যত দিন না ঝুমুর পাশ-টাশ করছে, চাকরিবাকরি পাচ্ছে, টাকা পাঠিয়ে দিক, আরামসে কোনো হস্টেলে থেকে যাবে ঝুমুর। সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের ঢের ভালো।

কথাটা একবার ছোটোমাসির কাছে পেড়েও ছিল ঝুমুর। উদ্বিগ্ন মুখে ছোটোমাসি বলেছিল, তুই আর ওদের খ্যাপামোটাকে উসকে দিস না তো ঝুম। দিদি-জামাইবাবুর ভালোবাসার নেচারটাই ও-রকম। অ্যাগ্রেসিভ টাইপ।

হবেও বা। তবে এই যদি প্রেম হয়, ঝুমুর জীবনেও তার ধারেকাছে ঘেঁষবে না। ভূতের কিল হজম করার সাধ ঝুমুরের অন্তত নেই।

বেল পড়ে গেছে। মহামূল্যবান নোটের বান্ডিল গুছিয়ে প্রস্থান করছেন এস কে এম। এরপর পরপর দুটো পাসের ক্লাস। ফিলজফি। দোতলার ষোলো নম্বরে। তৃণা, দোয়েল, সুমনরা উঠে পড়ল বেঞ্চি ছেড়ে। ডাকছে ঝুমুরকে। ইশ, খোনা-খোনা গলায় পি এম ম্যাডাম ন্যায়শাস্ত্র কচলাবেন এখন! ভাবতেই ঝুমুরের বিবমিষা জাগছিল। কায়দা করে বন্ধুদের এড়িয়ে সোজা চলে এল লাইব্রেরিতে। গোটাদুয়েক দরকারি বই ইস্যু করে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক পল দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কোথায় যে সে যায় এবার? ক্যান্টিনে? কমনরুমে? রিডিংরুমে গিয়ে বসবে দু-দণ্ড? ধুৎ, ভিড়ভাট্টা ভালো লাগছে না আজ, টুকটুক করে কেটে পড়াই ভালো। দুপুর দুপুর বাড়ি ফিরলে ঘণ্টাকয়েক তো বিন্দাস শুয়ে থাকতে পারবে।

শেষ বাসনাটাই মনঃপূত হল। পা চলিয়ে ঝুমুর ঝটিতি কলেজ গেটের বাইরে। বাসস্টপ অবধি পৌঁছোতে পারল না অবশ্য, তার আগেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

রাহুল!

বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল ঝুমুর, স্ট্রেট চলেই এসেছিস? যদি আমি চারটেয় সময় বেরোতাম?

—পারতিসই না। রাহুল দাঁত বের করে হাসছে, আজ আমার উইল ফোর্স কাজ করছে।

—মানে?

—এই তো, দশ মিনিটও কাটেনি... এর মধ্যেই কেমন টেনে বের করলাম তোকে!

—হুঁ, ঝড়ে বক মরল, ফকিরের কেরামতি বাড়ল!

—প্রোভার্বটা কার কাছে শিখলি? ঠাম্মা না দিম্মা?

—ভাট বকা ছাড়।... কী কথা আছে বলছিলি যেন?

—হচ্ছে, হচ্ছে। তাড়া কীসের! চোখ কুঁচকোল রাহুল। ঝুমুরকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, মুড অফ?

—তাতে তোর কী?

—ম্যাজিকে মন ভালো করে দিতে পারি। যাবি আমার সঙ্গে? নন্দনে? একটা ঝক্কাস মুভি এসেছে।

—কী ফিল্ম?

—লাইফ ইজ বিউটিফুল। বেনিনি যা করেছে না, হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলবি।

সিনেমাটার নাম ঝুমুরের শোনা। সামান্য দোটানায় পড়ে গেল ঝুমুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি না-ফিরে ঠান্ডা হলে বসে থাকাই বা মন্দ কী! ছবিটা নাকি দুরন্ত মজার, মনের গুমোট কাটলেও কাটতে পারে।

—ও কে, ঝুমুর কাঁধ ঝাঁকাল, কিন্তু যাবি কীসে? মেট্রো?

—অবশ্যই। এই ভ্যাদভ্যাদে গরমে বাসে ওঠে কোন বুরবক!

সত্যি হিউমিডিটির মাত্রাটাও যেন ঝপ করে চড়ে গেল আজ। ঝুলবর্ণ আকাশখানা এখন স্কাইস্ক্র্যাপার ছুঁই ছুঁই। রুপোলি ঝিলিক হানছে ঘনঘন। ঈষৎ তেরচা চোখে মেঘেদের সাজগোজ দেখতে দেখতে হাঁটতে শুরু করল ঝুমুর। কানের পাশে রাহুলের একটানা বকবক। আজ অবশ্য ক্যাসেট পালটেছে। একঘেয়ে প্যানপ্যানানির বদলে অ্যানাটমিরুমের কাহিনি। ঝুমুর শুনছিল ভাসাভাসাভাবে, মাঝেমধ্যে হুঁ, হাঁ করছিল। তাতে অবশ্য রাহুলের ভ্রূক্ষেপ নেই, একা-একাই চালিয়ে যাচ্ছে সংলাপ। সাধে কি ঝুমুরের ধারণা ছেলেটার মাথায় ক্যাড়া আছে!

পাতালরেল স্টেশন বেশ ফাঁকাই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ব্যাগ থেকে টাকা বের করছিল ঝুমুর, তার আগেই কাউন্টারে হাত গলিয়ে দিয়েছে রাহুল, দুটো রবীন্দ্রসদন দেবেন তো!

ঝুমুর দুম করে রেগে গেল। গুমগুমে গলায় বলল, এটা কী হল?

—কী?

—দেখলি আমি চেঞ্জ বের করছি, তুই আগ বাড়িয়ে টিকিট কাটলি কেন?

—যাহ বাবা! দোষের কী হল?

—আমি পছন্দ করি না। শিভালরি দেখানোর মেন্টালিটিটা ছাড়।

—চটছিস কেন? লেটস শেয়ার। সিনেমার টিকিটটা নয় তুই কাটিস। অবশ্য তোরই লস তাহলে! মাল্লু বেশি খসবে। রাহুল হ্যা হ্যা করে হাসল।

লাগসই একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল ঝুমুর, তখনই প্ল্যাটফর্মে ট্রেন। লাফাতে লাফাতে ভূতলে নামল দু-জনে, দরজা বন্ধ হওয়ার মুখে মুখে সেঁধিয়ে গেছে কামরায়। ট্রেন ছাড়তেই আবার নিজের কলেজের প্রসঙ্গটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলছিল রাহুল, ভাঁজ মেরে লাইন ঘুরিয়ে দিল ঝুমুর, তোর ফাইনাল এগজাম কবে রে?

—দেরি আছে। নেক্সট এপ্রিল।

—কী করবি তারপর?

—একটা বছর তো ফ্যাক খাটতে হবেই।

—তারপর?

—হাউসস্টাফ। তারপর নোকরি। পরীক্ষা-টরিক্ষা দিয়ে চলে যাব কোনো রুরাল হেলথ সেন্টারে। পাহাড়ে, জঙ্গলে যে চুলোয় হোক!

—বালাই ষাট। আসানসোলে তোর বাবার এত বড়ো রোরিং প্র্যাকটিস, ঘ্যাম নার্সিং হোম, কোন দুঃখে তুই গভর্নমেন্ট জয়েন করবি রে?

—আসানসোলে আমি থাকব না ঝুমুর।

—কেন?

—ইচ্ছে। আই হেট দ্যাট প্লেস।

—সে কী রে? তুই না তোর বাবার একমাত্র লাড়লা?

—উঁহু বাবার নয়, মা-র।

ঝুমুর থতমত। অস্ফুটে বলল, মানে?

একটু যেন দূরমনস্ক দেখাল রাহুলকে, মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি, ছাড় তো ওসব টপিক, ভালো লাগে না।

আজ রাহুলের ভালো না-লাগার সুরটা যেন অন্যরকম! কেমন যেন ভেজা ভেজা! রাহুলের বাবা-মা-র কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে? ছেলেটার কথা শুনে তো কখনো বোঝা যায়নি বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই? হুম, এখন যেন মনে পড়ছে বাবার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে রাহুল যেন একটু বাঁকাভাবেই জবাব দিয়েছিল! হেঁয়ালি, হেঁয়ালি! খোলাখুলি প্রশ্ন করবে? থাক, ছেলেটা হয়তো আহত হতে পারে।

ট্রেন চলছে, থামছে, চলছে। মাইক্রোফোনের ঘড়ঘড়ানিতে ঘোষিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ বোঝা দুষ্কর। চাঁদনি চক পেরোনোর পর কামরায় ভিড়ও বেড়ে গেল বেশ। এসপ্ল্যানেডে তো রীতিমতো ঠাসাঠাসি।

রাহুল এক বৃদ্ধাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে সুড়ঙ্গপথে আলো-আঁধারের খেলা, রাহুলের দৃষ্টি এখন সেদিকে। চোরা চোখে রাহুলকে দেখছিল ঝুমুর। বুকের ভেতরে ফের সেই শিরশিরে বাতাস বয়ে চলে কেন? হিম হিম? বাষ্পমাখা?

হঠাৎ রাহুল ডাকল, অ্যাই চল, নেমে পড়ি।

—রবীন্দ্রসদন এসে গেল নাকি?

—এসে যাবে। নাম তো, চটপট, চটপট।

রাহুলের তাড়া খেয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই ঝুমুরের চোখ বড়ো বড়ো, ওমা, এ তো ময়দান।

—জানি। রাহুলের হাসি এবার ফিরে এসেছে, বাকি পথটা হেঁটে মেরে দিই চল।

—অতটা এখন হাঁটব?

—একটু পয়দল মারলে পা ক্ষয়ে যাবে না ম্যাডাম।

—শো কিন্তু আরম্ভ হয়ে যাবে রাহুল।

—তো? নয় একটু দেরিতে ঢুকব। নয়তো...। রাহুল বাক্য সম্পূর্ণ করল না, ঝুমুরের কবজি ধরে টানছে, আয় আয়।

ঝুমুর ছাড়াতে পারল না হাতটা। কেন যে জোর পাচ্ছে না? ওই শিরশিরে বাতাসটার জন্যই কি? প্রায় টানতে টানতে ঝুমুরকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এল রাহুল। চরাচর এখন ঘোর মসিবর্ণ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

—ওয়াও! রাহুল দারুণ উচ্ছ্বসিত, হাত বাড়িয়ে ছুঁল বৃষ্টিকে। ছটফটে ভঙ্গিতে বলল, চল ঝুমুর ভিজতে ভিজতে যাই।

ঝুমুর বলল, খামোখা ভিজতে যাব কেন? আমার কাছে ছাতা আছে।

—দুর, এই বৃষ্টিতে ছাতা খোলে বুড়োবুড়িরা। চল তো।

—তারপর হেঁচে-কেশে মরি আর কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নো চিন্তা। সঙ্গে একটা হাফ ডাক্তার তো আছে।

কী কাণ্ড, ঝুমুরও আর প্রতিবাদ করতে পারল না কোনো! রাহুলের হাতে হাত রেখে নেমে এল বৃষ্টিতে। হাঁটছে পাশাপাশি। গুঁড়ো গুঁড়ো জলকণা মাখছে গায়ে। নীরবে।

রাহুলও কথা বলছিল না কোনো। আবার যেন অনেক কিছু বলছিলও। নিঃশব্দে। একটু একটু করে বাড়ছে বৃষ্টি, বড়ো হচ্ছে দানা, ঝিমঝিম ঝরে চলেছে অবিরাম। বৃষ্টিধারার ওপারে চেনা শহরটাকে এই মুহূর্তে অচিন লাগে। স্বপ্ন স্বপ্ন। যেন মানুষজন, ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, গাছপালা সবই আবছা ক্রমশ। যেন ঘষা কাচের ঘেরাটোপে অন্য এক অলীক নগরীর পথ বেয়ে অজানা কোথাও চলেছে দু-জনে।

কেন এমন ঘোর ঘোর লাগছে? ঝুমুর কি প্রেমে পড়ে গেল?

নিজেকে জোর করে ঝাঁকিয়ে নিল ঝুমুর। বুঝি-বা ফিরতে চাইল বাস্তবে। কথা বলার জন্যই কথা বলল, কী রে, বোম মেরে গেছিস যে?

—উঁ?

—কী যেন বলবি বলছিলি?

—বলব?

—শুনছি তো, বল।

রাহুল চুপ মেরে গেল আবার। বুঝি কথাগুলো গোছাচ্ছে মনে মনে। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ঝুমুরের আঙুলগুলো। তারপর হঠাৎই ঘড়ঘড়ে স্বর ফুটেছে, তোর জন্য আমার খুব মন কেমন করে রে ঝুমুর। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর।

এ-রকম একটা কিছু যে শুনবে, ঝুমুর তো জানতই। তবু যে কেন বুকটা ধক করে উঠেছে! চোখ নামিয়ে ঝুমুর বলল, কিন্তু... কিন্তু... আমি যে...

—কী?

—আই ডোন্ট বিলিভ ইন লাভ।

—কেন রে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কারণ, প্রেম বলে কিছু এগজিস্টই করে না। ভালোবাসা শব্দটাই একটা বকওয়াস।

—কী করে জানলি? এক্সপিরিয়েন্স আছে বুঝি?...

—সেকেন্ডহ্যান্ড। নিজের বাবা-মাকেই তো দেখছি। ঝুমুর বলব না বলব না করেও বলে ফেলল, জানিস আজ আমার বাবা-মা-র বিয়ের দিন।

—তাই নাকি? আজ তো তাহলে একটা মেমোরেবল ডে!

—আমার জন্য নয়। কেন যে ভুল দিনটা আসে প্রত্যেক বছর!

রাহুল কতটা কী বুঝল কে জানে, আবার চুপ। ঘাড় তুলে চোখে, গালে, কপালে বৃষ্টি মাখল একটুক্ষণ। মুছেও নিল মুখ। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য হাসি, ওদের কথা কি এই মোমেন্টে বাদ দেওয়া যায় না ঝুমুর? আয় না, আমরা শুধু আমাদের কথা বলি।

পূর্ণ দৃষ্টিতে রাহুলের দিকে তাকাল ঝুমুর। মনে মনে বলল, কিন্তু আমরা যদি পরে ওদের মতোই হয়ে যাই? যদি ভালোবাসা উবে যায়? যদি... যদি...?

না, একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না ঝুমুর। শ্রাবণ এখন তার চোখেও ভর করেছে যে! বৃষ্টি আর কান্না একাকার হয়ে গেলে কি আর কোনো শব্দ ফোটে গলায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে দেখা

সকালে প্রথম চোখ খুলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন অনুপমা। আর দেরি নয়, আজই বেরিয়ে পড়বেন। সময় বড়ো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তার আগে তাঁকে একবার পৌঁছোতেই হবে সেখানে।

বিছানায় উঠে বসে অনুপমা দু-হাতে চোখ ঘষলেন ভালো করে। জোরে জোরে শ্বাস টানলেন। রোজকার মতোই রাতভর বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কখন যেন ভোরের মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ঘুম ভাব। অনিদ্রার ক্লান্তি এখনও জড়িয়ে আছে চোখের পাতায়। শরীর নতুন করে গড়িয়ে পড়তে চাইছে। না, আজ আর কোনো ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না অনুপমা। পুবের জানলা দিয়ে ওই যে শৈশবের মতো নিষ্পাপ নতুন সকালটা এক মুঠো নরম আলো ছড়িয়ে হামা টানছে ঘরের মেঝেতে, ওই আলো প্রবীণ হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার। বলা যায় না ভোরের ইচ্ছে বেলা বাড়লে কখন ফুরিয়ে যায়!

খাট থেকে নেমে অনুপমা রোজকার মতোই ঠাকুর প্রণাম সারলেন আগে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল বসালেন। বাথরুম থেকে মুখ চোখ ধুয়ে এলেন। ভোরের এমন সুন্দর আলোতেও গোটা বাড়ি ভূতুড়ে রকমের থমথমে। এ সময় রোজ এ-রকমই থাকে। এ-বাড়ির আর সবার এখন মাঝরাত। সাতটা নাগাদ কাজের লোক এসে চা করে ডাকলে তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একে একে বিছানা ছাড়বে সকলে। ততক্ষণে অনুপমা পৌঁছে গেছেন স্কুলে। গেছেন মানে ক-দিন আগে অবধি যেতেন। ঘুম থেকে উঠেই চা বিস্কুট খেয়ে নিজের টিফিন নিজেই তৈরি করে নিতেন। দু-চার পিস মাখন পাউরুটি, একটা ডিমসেদ্ধ বা কলা, ব্যস। স্বামী বেঁচে থাকতে অবশ্য তাঁর জন্যও এক কাপ চা বানাতে হত। মারা যাওয়ার আগে, শেষ দুটো বছর, কে জানে কেন সমীরণও উঠে পড়তেন তাড়াতাড়ি। বেলা না-বাড়া পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারটায় বসে থাকতেন চুপটি করে। সেও তো প্রায় বছর দশেক আগের কথা।

সমীরণ তখন মাঝে মাঝেই গজগজ করতেন— এখনও তোমাকে নিজে চা তৈরি করে খেয়ে বেরোতে হবে কেন?

—কী করব? ভালো একটা রাতদিনের কাজের লোক আর পাচ্ছি কোথায়?

—কেন? খোকনের বউ উঠে একটু করে দিতে পারে না?

শুনে অনুপমা চোখ পাকাতেন— আস্তে বলো। শুনতে পাবে।

—শুনুক। শাশুড়ি উঠে সকালবেলা এতগুলো কাজ সেরে চাকরি করতে বেরোবে...

—থামো তো। নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন তো একটু বেলা অবধি ঘুমোবেই।

—নতুন আর কোথায়। বছর তো ঘুরতে চলল!

—বা রে, বছর ঘুরলেই বুঝি নতুন পুরোনো হয়ে যায়?

সমীরণ হেসে ফেলতেন। হাসতে হাসতেই একটা সিগারেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরাতেন— তাহলে আমরা দু-মাসেই পুরোনো হয়ে গেছিলাম বলতে চাও?

—আমাদের কথা বাদ দাও।

—কেন? বাদ দেব কেন? আমার সব মনে আছে। যত তোমাকে আটকাতে চাই তুমি ছটফট করে মরো। কী, না শাশুড়ি রাগ করবেন, বাড়ির সবাই কী ভাববে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বলব না? তোমার মা যা ছ্যার ছ্যার করে কথা শোনাতেন।

—তুমিও তোমার ছেলের বউকে কিছু বলো।

অনুপমা গম্ভীর হয়ে যেতেন— ছিঃ, তোমার মা বলতেন বলে আমাকেও সেটা রিপিট করতে হবে। তা ছাড়া দিনকাল এখন বদলে গেছে। ওভাবে আর বলা যায় না।

—বেশ তো। আমার কী! বুড়ো বয়সেও তবে খেটে মরো।

—খাটছিই তো। যতদিন হাত পা আছে নিজেরটুকু নিজেই করে নেব। আমি কারুর অপেক্ষায় থাকি না।

বলতেন বটে, তবু কখনো কি একবারের জন্য হু হু করে ওঠেনি মনটা? কে-ই বা কবে তাঁর জন্যে কিছু করেছে? সমীরণ যে সমীরণ তিনিও তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলেননি, তুমি সরো, তোমার টিফিনটা আজ আমি তৈরি করে দিচ্ছি। খোকনও তো একদিন মুখ ফুটে বলতে পারত— তুমি আজ রেস্ট নাও মা। আমি ঘরের সব কাজ করে দেব। কেউ বলেনি। অনুপমা যখন চাকরিতে ঢোকেন, খোকনের বয়স তখন পুরো দশ। পাকিস্তানের সঙ্গে পুজোর ঠিক মুখে মুখে যুদ্ধ লেগেছিল সেবার। তখন থেকেই তো ঘর বার দু-হাতে সামলাতে হয়েছে অনুপমাকে। তাও সে সময় শাশুড়ি ছিলেন, ছোটো জা ছিল। দু-দুটো আইবুড়ো ননদও ছিল সংসারে। তবু ঘরের কাজে ফাঁকি দেওয়ার জো ছিল না। স্কুল থেকে খেটেখুটে ফিরে প্রাণ-মন দিয়ে সাহায্য করতে হত সকলকে। করতেই হয়। মেয়েদের জীবনটাই যে এ-রকম। তাদের শরীর শরীর নয়। মনটাও মন নয়। অনুপমারও এ নিয়ে অভিযোগ ছিল না কোনো। উলটে জেদ ছিল। কারুর ওপর নির্ভর করবেন না। করেনওনি। তবুও কেন যে ইদানীং বুকের ভেতর একটা গোপন কান্না দানা বাঁধতে চায়! বড়ো অর্থহীন মনে হয় সব কিছু। কার জন্য, কীসের জন্য খেটে মরলেন জীবনভর? সমীরণ চলে গেলেন দুম করে। বিনা নোটিশে। ছেলে, ছেলের বউ নিজেদের ঘিরে একটু একটু করে আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে তুলল। সংসারও এখন তাদেরই। তাদের ছেলে, তাদের মেয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের নিজস্ব সুখ, দুঃখ, সমস্যা। অনুপমার সেখানে জায়গা কোথায়? জায়গা কি আদৌ কোথাও ছিল? সংসারে? বাইরে? থাকে কি? বৃথাই মানুষ ভাবতে ভালোবাসে তাকে ঘিরেই পৃথিবী চলেছে। তার জন্যই সূর্য উঠছে। চাঁদ ডুবছে। তার জন্যেই বেঁচে আছে প্রিয় পরিজন। ভুল ভুল। এ এক ভয়ানক নিষ্ঠুর ভ্রান্তি। প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলের এক কোনায় বসে অনুপমা চা শেষ করলেন। শু-ধু চা'ই। আর কিছু খেতে ভালো লাগছে না। যদি প্রয়োজন হয় সেখানে পৌঁছে কিছু খেয়ে নেবেন। পথ তো বেশি নয়। টার্মিনাস থেকে বাসে বসলে অন্য প্রান্তে পৌঁছোতে বড়োজোর ঘণ্টাদেড়েক। ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়তে পারলে আরও কম সময় লাগবে। ইচ্ছে করলে খাওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারবেন। বেরোনোর আগে শুধু স্নান সেরে নেওয়া দরকার।

ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি শাড়ি ব্লাউজ গুছিয়ে নিতে গিয়েও অনুপমা থমকে দাঁড়িয়েছেন। দরজার মাথায়, দেওয়ালে, সমীরণের ছবি। মারা যাওয়ার মাস আট নয় আগে তোলা। বোধ হয় খোকনদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন। অনুপমা স্থির তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। প্রথম প্রথম প্রতিদিন বাসি মালা ফেলে টাটকা মালায় সাজিয়ে দেওয়া হত সমীরণকে। অনুপমাই দিতেন। তারপর কবে থেকে যে মালা পালটানোর ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগল! শেষ কবে মালা পরানো হয়েছিল ছবিতে! শুকনো কালো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে অনুপমার বুকটা হাহা করে উঠল। এ-রকমই তবে হয়। এভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হয় সকলেই! এমনকী একান্ত প্রিয়জনও! নিজের বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ছাড়া আর মনে পড়ে না তাকে। এতকাল পর এই যে সেদিন হঠাৎই সেই মুখটা মনে পড়ে যাওয়া, সেটাও কি তবে নিজের প্রয়োজনে! ওই ছবির মানুষটা, যাঁর সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ঘর করেছেন, সুখদুঃখ হাসিকান্না ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মতো করে, যাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভাবতে চাননি কখনো, তাঁর কথাই তো আগে মনে পড়া উচিত ছিল। অথচ সমীরণ নন, ছেলে নাতিনাতনিরাও নয়, আত্মীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিজন বন্ধুবান্ধব কেউ নয়, এমনকী অনুপমার এতদিনকার প্রিয় পরিবেশের ছোটো বড়ো কোনো স্মৃতিও নয়, বিদায়ের মুহূর্তে একচল্লিশ বছর আগের একটা মুখ কেন যে চকিতে ভেসে উঠল মনের পর্দায়! তাও অমন এক ভরাট সভার মাঝে!

স্কুল ছুটির এক পিরিয়ড আগে সেদিন শুরু হয়েছিল অনুপমার বিদায়ী অনুষ্ঠান। ফেয়ারওয়েল। স্কুলের বড়ো হল ঘরটায়, কাঠের ডায়াসের ওপর বসানো হয়েছে তাঁকে। তাঁর দু-পাশে স্কুলের বাকি চার সিনিয়র টিচার। সুষমা, রমা, কেয়া, প্রতিমা। সামনে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা প্রকাণ্ড এক টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়। ছাত্রীরা বসেছিল বেশ খানিকটা তফাতে, ডায়াসের নীচে শতরঞ্চিতে। তাদের পিছনে, আরও দূরে সার সার চেয়ারে বাকি সব শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছোট্ট একটা ফুটফুটে মেয়ে এসে যখন মালা পরিয়ে দিল অনুপমাকে, হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া, সঙ্গে একরাশ বিদায়ী উপহার, তখনও এক অন্য ধরনের আবেগে আচ্ছন্ন ছিলেন অনুপমা। সে-আচ্ছন্নতায় শূন্যতাবোধ ছিল। শূন্যতাবোধ? নাকি হাহাকার? হারিয়ে যাওয়ার। ফুরিয়ে যাওয়ার। বাতিল হয়ে যাওয়ার।

মেয়েটি স্টেজ থেকে নেমে যাওয়ার পর সুষমা উঠলেন ভাষণ দিতে। তখনও অনুপমার বুক জুড়ে হালকা কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে শূন্যতাটা। তাঁর আঠাশ বছরের কর্মজীবন কেমন নিবে যাচ্ছে এক ফুঁয়ে। খুব মন কেমন করছে। খুউব। তিনি যে কাল থেকে এই স্কুলের আর কেউ নন এ-কথাটা ভেবেও ভাবতে পারছেন না কিছুতেই। ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে আছেন। সুষমা কত কথা যে বললেন, কানেই গেল না।

সুষমা বসে পড়ার পর ক্লাস নাইনের সেই মেয়েটি উঠল গান শোনাতে। মেয়েটির গান আগেও কয়েকবার শুনেছেন অনুপমা। ভারি মিষ্টি গলা। প্রথমেই ঢিপ করে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। সব গানই অনুপমার চেনা। বহুবার শুনেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু হঠাৎ যে কী হয়ে গেল! প্রতিটি কলি, সুর যেন অনুপমার হৃদয়কে ভেদ করে চলে যাচ্ছিল সেদিন। সব কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। সব। অনুপমার বর্তমান, অনুপমার অতীত, অনুপমার ভবিষ্যৎ। তিনি শিহরিত হচ্ছিলেন বার বার। গানের সুরে ভাসতে ভাসতে এ কোথায় চলে যাচ্ছেন তিনি! কোনো কোনো মুহূর্তে গানও তবে পারে জীবনকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে চলে যেতে! নাকি গানটা উপলক্ষ্য মাত্র! প্রান্ত থেকে প্রান্তে ফেরার এ প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরও আগে থেকে। কবে থেকে যে শুরু হয়েছিল! সমীরণের মৃত্যুর পর থেকে! না আরও আগে! নাকি সারাটা জীবন ধরেই!

অনুপমা চোখ বুজে ফেলেছিলেন। গাইতে গাইতে মেয়েটি অন্তরা থেকে সঞ্চারিতে যাচ্ছে, সঞ্চারি থেকে অন্তরায়। অনুপমাও ফিরতে থাকলেন। সঞ্চারি থেকে অন্তরায়। শেষ থেকে শুরুতে। যত নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন, বন্ধ চোখের পাতায় ফুটে উঠেছে সে। বহুদূর থেকে যেন ডাকছে— চিনতে পারছ অনু?

অনুপমা মনে মনে উত্তর দিলেন— পারছি। তুমি কি আছ এখনও? কোথায় আছ?

সে বলল— তোমার মনেই আছি। নিবিড় নিশীথ পূর্ণিমা নিশীথিনী সম... গান শেষ হয়ে গেল। মেয়েটি আবার কাছে এল অনুপমাকে প্রণাম করতে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও মেয়েটির নাম কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। কী যেন? কী যেন? অনন্যা? না অপরূপা? মেয়েটির মাথায় হাত রেখে গাঢ় চোখে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। আঃ, কী সুন্দর মনভোলানো গন্ধ যে সতেজ কিশোরীর গায়ে!

রমা কানের কাছে মুখ নিয়ে এল— অনুপমাদি, এবার আপনি আমাদের কিছু বলুন।

অনুপমা ফিসফিস করে উঠলেন— কী বলব?

—বা রে, যাওয়ার আগে শেষ কথা বলবেন না আমাদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপমা শিউরে উঠেছেন। শেষ কথা কি বলা যায় কখনো? চাইলেও কি বলা হয়ে ওঠে?

কথাগুলো কি সেদিন সত্যি সত্যি সহকর্মীদের বলে ফেলেছিলেন অনুপমা? নাকি মনে মনেই উচ্চারণ করেছিলেন? মনে পড়ছে না। মাত্র ক-দিনেই স্মৃতি বড়ো ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। একচল্লিশ বছর আগের মুখ ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগের কথা মনে নেই।

একচল্লিশ বছর আগের মুখ বলছে— তোমাকে যে আমার একটা কথা বলার ছিল অনু।

একচল্লিশ বছর আগের অনুপমা কাঁপছেন থিরথির। সেদিনই তাঁকে আশীর্বাদ করে গেছেন সমীরণের বাড়ির লোকেরা। আগামী তেইশে শ্রাবণ তার বিয়ে। তবু থর থর স্বরে প্রশ্ন করে ফেলেছেন— কী কথা?

—থাক। আর বোধ হয় বলার সময় নেই।

অনুপমা আরেকবার তাকালেন সমীরণের ছবির দিকে। বউমার পাঠানো খবর পেয়ে স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে যখন বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন, তখন প্রায় সব শেষ। সমীরণের শরীর নিশ্চল হয়ে এসেছে, দৃষ্টি অস্বচ্ছ। ঠোঁট দুটো খালি কেঁপে চলেছে অবিরাম।

বউমা ডুকরে উঠেছিল— বাজার থেকে ফিরে বাবা হঠাৎ ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। প্রচণ্ড ঘামছিলেন। নিশ্বাস নিচ্ছিলেন জোরে জোরে। আমি দৌড়ে আসতে কোনোরকমে শুধু বলতে পারলেন, মাকে ডেকে আনো। ব্যস, তারপরেই আর কিছু বলতে পারছেন না।

অনুপমা স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন— কী কষ্ট হচ্ছে বলো।

সমীরণ অস্ফুটস্বরে কী যেন বলতে চাইছিলেন, অনুপমা বুঝতে পারলেন না। নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার পর আরও একটা দিন বেঁচে ছিলেন সমীরণ। সারাক্ষণ ঠোঁট দুটো তাঁর শুধু কেঁপেই গেছে। শেষ কথাটা কিছুতেই বলতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপমা কপাল টিপে ধরলেন। সমীরণের ওই শেষ কথা বলতে না-পারা, যাট বছর বয়সে পৌঁছে অনুপমার এই ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়, জীবন থেকে বাতিল হওয়ার মুহূর্তে ওভাবে একচল্লিশ বছর আগের একটা মুখ মনে পড়ে যাওয়া, যাকে এতদিন ধরে তেমনভাবে মনে পড়েনি কখনোই, এই সব কিছুর মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে কি? কোনো শেষ কথা শোনার তাড়না? হয়তো সেও ভুলে গেছে কথাটাকে। ভুলতেই পারে। একচল্লিশ বছর সে বড়ো দীর্ঘ সময়। তবু অনুপমা যাবেন একবার। শেষবারের মতো তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। প্রশ্ন করবেন— কী বলতে চেয়েছিলে সেদিন আজ বলো।

ভীষণ অবাক হয়ে যাবে সে— তুমি এতদিন পর জানতে এলে। এই বুড়ো বয়সে।

অনুপমা কী উত্তর দেবেন?

বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে অনুপমা ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে চাইছিলেন নিজেকে। দেখা হবে তো শেষ পর্যন্ত? দাদা মারা যাওয়ার পর ভাইপোরা যখন বাড়ি বিক্রি করে চলে এল, তখনও তো সে ওখানেই ছিল। খোকনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে শেষবার যখন গিয়েছিলেন ওখানে, তখনও দেখা হয়েছে। ছেলের বিয়ের কার্ড তার হাতে দিয়ে অনুপমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন— আসবে তো?

ক্লিষ্ট হাসি হেসেছিল সে, যেতে তো খুবই ইচ্ছে করে। শরীর দেয় না। কোমরের যন্ত্রণায় বড়ো কাবু হয়ে পড়েছি।

—রিটায়ার করে গেছ?

—নাহ্। আর বছর তিনেক বাকি আছে। অফিসটা যাই কোনোরকমে।

সমীরণ বলেছিলেন— যদি আসতে পারেন খুব ভালো লাগবে।

আসেনি। অনুপমারও একবারের জন্যও মনে হয়নি তার কথা। মনে হওয়ার তো কারণও ছিল না কোনো। স্বামী সংসার নিয়ে যার ভরাট সংসার তার তো পুরোনো কোনো মুখ, যা শুধু তাঁর কাছে একটা মুখই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল মাত্র, তা মনে পড়ার কথাও নয়। সমীরণ মারা যাওয়ার পরও মনে পড়েনি কোনোদিন। তবু কেন যে সেদিন...!

স্নান-টান সেরে অনুপমা যখন তৈরি হয়েছেন বেরোনোর জন্য, শেষ বসন্তের সকাল তখন বেশ ঘন হয়ে গেছে। নাতিনাতনি দু-জন তৈরি হচ্ছে স্কুল বেরোনোর জন্য। বউমা ব্যস্ত তার নিজের সংসার নিয়ে। খোকন খবরের কাগজ পড়ছে তার বাবার ইজিচেয়ারে বসে। ইদানীং খোকনের হাবভাব কেমন যেন সমীরণের মতো হয়ে যাচ্ছে। চেয়ারে ওই বসে থাকার ভঙ্গিটাও। সমীরণের গলাতেই খোকন অনুপমাকে প্রশ্ন করল— ফিরছ কখন?

অনুপমা সিঁড়ির ধাপিতে একটু দাঁড়ালেন— দেখি।

—কোথায় যাচ্ছ তাও তো বলে গেলে না!

অনুপমার বলতে ইচ্ছে করল, যাচ্ছি না রে, ফিরছি।

কিছুই বললেন না। সমীরণের থেকেও বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত খোকনের দিকে তাকিয়ে আলগা হাসলেন মাত্র।

দুই

শেষ এসেছিলেন এগারো বছর আগে। বাপের বাড়ির পাট এখান থেকে উঠে যাওয়ার পর এদিকে আর আসা হয়নি। বাস থেকে নেমে তাই বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন অনুপমা। মাত্র এগারো বছরের অদর্শনেই কত বদলে গেছে জায়গাটা! বাসস্ট্যান্ডে আগে একটা বিরাট মিষ্টির দোকান ছিল, পাশে সেই কবে থেকে দেখা সেলুন, সাইকেল সারানোর ঘর। কিছু নেই। তার জায়গায় উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রাক্ষুসে বহুতল অট্টালিকা। সরু গলিটাও কত চওড়া হয়ে গেছে। সাইকেল রিকশায় বসে সব কিছুই কেমন অচেনা লাগছিল অনুপমার। ফুটবল খেলার মাঠটা কোথায় গেল! ঘোষেদের পুকুর! এতসব ফ্ল্যাটবাড়িই-বা উঠল কবে! এতটা পথ চলে এলেন; একটাও চেনা মানুষ নজরে পড়ল না। অনুপমা ক্রমে শঙ্কিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছিলেন। চৈত্রের দামাল বাতাসে রিকশার গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, রোদ ঝমঝম রাস্তায় ধাতব চাকা কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ তুলে প্রশ্ন করছে, কোথায় এলে? যাচ্ছ কোথায়? ক্ষণিকের জন্য অনুপমার মনে হল রিকশাঅলাকে বলেন ফিরে যেতে, পরক্ষণেই এক তীব্র ঝাঁকুনি। বাঁকের মুখে গাড্ডায় পড়ে রিকশা লাফিয়ে উঠেছে। অনুপমারও হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। চাপা উত্তেজনায় রিকশার হাতল খামচে ধরেছেন। ওই তো তাঁর পরিচিত বটতলা,মোড়ের মাথায় শৈশবের শিরীষ গাছ। ওই তো দেখা যাচ্ছে তাঁদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িটা। রং বদলে গেলেও বাড়িটা আছে। অনুপমা বড়ো করে শ্বাস টানলেন। এখনও সব হারায়নি তাহলে! অনুপমা লক্ষ করলেন তাঁদের বাড়ির পিছন দিকের বাড়িটাকেও দেখা যাচ্ছে এবার। বিসদৃশভাবে প্রাচীন বাড়ির গা ঘেঁযে নতুন এক ইমারত। রিকশা পুরো একটা চক্কর মেরে পাশের বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রিকশা থেকে নেমে পুরোনো আমলের লোহার দরজাটার সামনে কয়েক সেকেন্ড অনুপমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার পাশে কাঠের লেটার বক্সে পর পর নামের সারি। তার সব ভাইপোদের নাম। তার নাম কোথায় গেল? অনুপমার বুক ধড়ফড় করে উঠল। হঠাৎই বেশ জোরে কড়া নেড়ে ফেলেছেন।

ভিতর থেকে বৃদ্ধার কণ্ঠ শোনা গেল— কেএএএ?

কে তিনি? কী জবাব দেবেন অনুপমা!

অনুপমার জবাবের আগেই অবশ্য দরজা খুলে গেছে।

—কাকে চাই? বলতে গিয়েও চিনেছেন ভদ্রমহিলা। মুখের প্রশ্ন মুখেই রয়ে গেল। অবাক দৃষ্টি স্তব্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অনুপমা মৃদু হাসলেন— চিনতে পারছ না বউদি?

স্তব্ধ চোখে সঙ্গেসঙ্গে হাসি ফুটেছে— ওমা চিনব না কেন! এসো! ভেতরে এসো।

বউদি হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন অনুপমাকে। বাড়িটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও সেই একইরকম আছে। তবে সাবেকি আমলের বাড়ি ভেঙে গেছে আরও। দেওয়াল দরজার অবস্থা জীর্ণতর।

—এদিকে তো আর আসই না তোমরা!

অনুপমা উত্তর দিলেন না। উৎসুক চোখ এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে বারংবার। সে কি তবে নেই? বাড়িটা অসম্ভব ফাঁকা ফাঁকা। এত ফাঁকা যে দালান উঠোন সব কিছুকেই বড়ো বেশি দীর্ঘ মনে হচ্ছে। বউদির ঘরে ঢোকার আগে অনুপমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, বাড়িতে কেউ নেই বউদি?

—না ভাই। এখন আর কে থাকবে বল। ছেলেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। বাচ্চারা স্কুলে। আর বউমারা তো দোতলা থেকে নামেই না বড়ো একটা।

—তুমি একাই নীচে থাক?

—হ্যাঁ ভাই, তোমার দাদা মারা যাওয়ার পরে এই নীচেই আমার স্থান হয়েছে। বুড়ো হলে মানুষের তো এই দশাই হয়। চৌকিতে পাতা জীর্ণ এক বিছানায় বসে অনর্গল বকবক করে চলেছেন বউদি— ছেলেরা দোতলায় যে যার মতো ভিন্ন হয়েছে এখন। আমি আছি আমার মতো। বলতে বলতে চোখ মুছলেন— দুঃখের কথা আর কত শুনবে বলো। বাদ দাও। তুমি কেমন আছ? এখনও ইস্কুলে পড়াচ্ছ?

—না রিটায়ার করেছি। চার দিন।

—ও। বউদি আবারও চোখ মুছলেন— ঠাকুরজামাই মারা যাওয়ার খবর কার মুখ থেকে যেন শুনেছিলাম। আহা, বড়ো তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

অনুপমা মাথা নামালেন। ভার জমছে বুকে।

—ছেলে বউ সব ভালো আছে তো? নাতিনাতনি ক-টি তোমার?

—দুটি। অনুপমা দায়সারা উত্তর দিলেন। কথা বলতেও ভালো লাগছে না। বউদি এত কথা বলছে, কেন একবারও তার কথা বলল না?

—তোমার ন্যাওটা হয়েছে তারা? কাছে আসে? আমার ছোটো নাতনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো ঠাম্মা বলতেই অস্থির। কিন্তু মেজো বউ কিছুতেই তাকে আমার কাছে আসতে দেয় না। বলে বুড়িদের সঙ্গে মিশলে নাকি বাচ্চাদের অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়। কেন রে, আমাদের সময়ে কি ঠাকুমা দিদিমা ছিল না? আমরা তো...

কথাগুলো অনুপমার আর কানে যাচ্ছে না। নীরবে একটা ভাঙা বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আর্তনাদ শুনছেন শুধু। কী দাপট ছিল বউদির একসময়। কী মুখ। কারণে অকারণে তাঁদেরকেও কত সময় মুখঝামটা দিয়েছেন। সাত বাড়ি ঘুরে নিজের রান্নার সুখ্যাতি নিজেই শোনাতে শোনাতে পাগল করে দিয়েছেন সকলকে। অনুপমা কথা বললেন এতক্ষণে— তা রান্নাবান্না কি এখনও তোমার ঘাড়ে?

পলকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল বউদির মুখ, পর মুহূর্তেই মলিন— ছেলেদের আর সে কপাল কী আছে যে আমার রান্না খাবে! এখন চাউমিন, রোল এসবের যুগ। ওসব কি আর আমরা পারি! তোমার দাদার পেনশনের টাকা ক-টা আছে, আর ওই ন্যালাখ্যাপা দেওর। আমরা দুজনে নীচতলায়... যে-লোকটা ওদের জন্য বিয়ে পর্যন্ত করল না, ভাইপো ভাইঝি বলে সারাজীবন অস্থির, তাকেও পৃথক অন্ন করে দিল।

কে জানে কেন বুকের ভেতর একটা সুচ বিঁধছে অনুপমার। ভাইপো ভাইঝিদের জন্যই কি বিয়ে করেনি লোকটা! নাকি অন্য কারণ ছিল! হয়তো-বা অনুপমার জন্যই...! সুচ বেঁধার যন্ত্রণার ক্ষত ধীরে ধীরে গোপন অহংকারে ভরে যাচ্ছে। হাসিও পেয়ে গেল। তার জন্য সে বিয়ে করেনি এই চিন্তাটা কি বেশি বাড়াবাড়ি নয়? যেরকম খেলাপাগল ছিল সে! হয়তো-বা সেজন্যই বিয়ের কথা ভাবেনি কখনো। পাড়ার ফুটবল টিম নিয়ে সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই বেহুঁশ তালহীন আধপাগল থাকত একসময়। খেলা নিয়ে একবার অফিসেও কী এক গণ্ডগোল হয়েছিল না? যখন-তখন কাউকে না-বলে অফিস থেকে পালিয়ে আসা...? সে প্রায় চাকরি যায় যায়! দাদার মুখে অনুপমা শুনেছিলেন একবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপমা জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার দেওর আজকাল আর মাঠে যায় না? ওকে ছাড়া এখন পাড়ার ফুটবল ক্লাব চলে?

—সব চলে রে ভাই। সব চলে। ওই কোমরের ব্যথাটা এত বেড়ে উঠল যে মাঠের নাম পর্যন্ত ভুলতে বাধ্য হল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কও নেই আর। তারা ক্লাবে ঘেঁষতেও দেয় না। বুড়ো সামনে থাকলে বিড়ি সিগারেট খেতে অসুবিধে হয়, তাই বোধ হয়...

অনুপমা হেসে ফেললেন— তোমাকে ছেলেরা বলেছে বুঝি?

—ছেলেরা কেন বলবে? ঠাকুরপোই গজগজ করে। ছুতোনাতায় ক্লাবের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঝগড়া করে ছেলেগুলোর সঙ্গে।

এবার একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন অনুপমা। পাড়ার ছেলেরা উদ্দাম চিৎকার করছে... হা হা আনন্দধ্বনিতে গোটা অঞ্চল দুলে দুলে উঠছে... নীল হলুদ জার্সিপরা একজনকে কাঁধে নিয়ে ঘুরছে এক দল বুটপরা জার্সি গায়ে যুবক। কাঁধের মানুষটার হাতে এক বিশাল সোনালি রঙের ট্রফি। পাড়ার সমস্ত জানলা দরজায় অসংখ্য চোখের ভিড়। সকলে একজনকেই দেখছে।

কতদিন হবে? পঁয়তাল্লিশ বছর? তেতাল্লিশ বছর? সদ্য তখন শাড়ি ধরেছেন অনুপমা। জোড়া বিনুনি ময়াল সাপের মতো পিঠ ছাপিয়ে কোমরের কাছাকাছি। অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত চলে গেল অনুপমার। ময়াল সাপ দুটো এখন টিকটিকির লেজ।

ভাবতে ভাবতেই বাইরে একটা কাশির শব্দ বেজেছে। ঘড়ঘড়ে, শ্লেষ্মা জড়ানো।

অনুপমা টান টান হলেন।

বউদি বললেন— ওই ঠাকুরপো এল বোধ হয়। বাজার সেরে ব্যাঙ্কে যাবে বলেছিল।

লোকটা ঘরে ঢুকতে অনুপমা চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগারো বছর আগেও এ-রকম চেহারা তো ছিল না! পোশাক আশাকেরও না। গাল দুটো তোবড়ানো বাটির মতো ঢুকে গেছে, মাথায় একটাও চুলের চিহ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, ভুরু জোড়া সাদা, খাড়া খাড়া। চোখের মণিও নিষ্প্রভ। লুঙ্গিটা ময়লা। জামাটাও।

ঘরে ঢুকে বেশ খানিকক্ষণ পর সে চিনতে পেরেছে অনুপমাকে। হাতের থলি বউদির হাতে দিতে দিতে বলছে— অনু যে! কতক্ষণ! এদিকে হঠাৎ।

অনুপমা ঢোক গিললেন— এমনিই এসেছিলাম। তোমাদের সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। তোমার জন্যই তো কতক্ষণ ধরে বসে আছি।

হাতের উলটো পিঠে ঘাম মুছিয়ে সে হাসল আলতো— আর বোলো না, কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার, কবে একটা সাত পার্সেন্ট ডি.এ. বেড়েছে, এখনও ব্যাঙ্কে তার খবর আসেনি। সেই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে... বলতে বলতে থমকেছে একটু— তারপর তোমার আর কদ্দিন?

জিজ্ঞাসার ভঙ্গি দেখে অনুপমা হেসে ফেললেন ফিক করে। কিশোরীর মতো হাত উলটে বললেন, নেই। রিটায়ার করে গেছি।

অনাবিল হাসিতে তোবড়ানো গাল আরও বীভৎস হয়ে গেল— এবার বুঝবে ঠেলাটা। আমাদের তাও গরমেন্ট সার্ভিস ছিল, দু-আড়াই বছরের মধ্যে জোটানো গেছিল টাকাপয়সা। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে আগে ননরিফান্ডেবল লোন নিয়ে নিয়েছ তো?

অনুপমা ঘাড় নাড়লেন— না তোলা হয়নি।

—তবে গেছ। এবার প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে ক-টা জুতো শুকতলা যায় দেখ। তোমাদের তো আবার স্কুল। সার্ভিস বুক-টুক ঠিকঠাক আছে তো?

—আছে বোধ হয়। অত খেয়াল করিনি।

—খেয়াল করনি! উত্তেজনার দমকে আবার কাশতে শুরু করল সে। কাশি সামলে বলল— পেনশন গ্র্যাচুইটির পেপার তৈরি হতে হতেই তো তোমার জীবন কাবার হয়ে যাবে। খাড়া খাড়া ভুরু চাপা ধূর্ততায় কাঁপছে টিপটিপ— আমি তো রিটায়ারমেন্টের এক বছর আগে থেকে সব কাগজপত্র তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। ওই তো বারীন, যে তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের বাড়িতে থাকত, কত হাসত আমাকে নিয়ে, ও তো পেনশন হাতে আসার আগে মরেই গেল।

বারীনের মুখটা অনুপমার চোখের সামনে এসেও মিলিয়ে গেছে। নীল হলুদ জার্সির মুখে এখন এইসব কথা একদম ভালো লাগছিল না তাঁর। চাকরি, পেনশন, রিটায়ারমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, এর বাইরে কি আর কোনো পৃথিবী নেই তার? অনুপমা কথা ঘোরাতে চাইলেন—বউদি বলছিল তোমার কোমরের ব্যথাটা আরও বেড়েছে? ডাক্তার দেখাচ্ছ?

—ওই একজন শখের হোমিয়োপ্যাথকে দেখাই আর কি। আমাদের পার্কের আড্ডায় আসে। রিটায়ারমেন্টের পর থেকে বই পড়ে পড়ে ডাক্তারি শিখে ফেলেছে। ব্যথা কমে না, তবে ভিজিটের পয়সাটা বেঁচে যায়।

বউদি অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠলেন, ওইতো এখন করতে হবে। যা কিছু পয়সা হাতে এসেছিল বললাম রেখে দাও, তা না-করে দোতলার ঘরগুলোর পেছনে একগাদা পয়সা ঢেলে বসল...

—বাজে বোকো না তো। হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠছে সে। অনুপমা স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার একরাশ নোংরা দাঁতের মাঝে চারটে দাঁত চকচক করছে। বাঁধানো। কী বেমানান!

—যাও না, একটু চা করে নিয়ে এসো না। বাঁধানো দাঁত বুজে গেল।

অনুপমা বলতে গেলেন, আমি চা খাব না, তার আগেই বউদি উঠে গেছেন ঘর থেকে। দু-জনে একা এবার।

—তোমাদের কাগজপত্র তো সব ডি.পি.আই. অফিসে তৈরি হয়, তাই না?

সমীরণ বেঁচে থাকলেও কি এইসব কথাই বলতেন এসময়? হয়তো বলতেন। হয়তো বলতেন না। রিটায়ারমেন্ট নিয়ে মানুষটার মধ্যে কোনো ভাবনাচিন্তার ছায়াও অনুপমা দেখতে পাননি কোনোদিন। কে জানে সেজন্যই হয়তো অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সমীরণ। অনুপমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন। নিঃশব্দ হয়ে গেলেন আচমকা। হঠাৎই যেন ঘরের ভেতর সব কথা ফুরিয়ে গিয়ে থমথম চতুর্দিক। চৈত্রের উত্তাপ বাইরে থেকে মৃদুভাবে ঢুকে পড়েছে ঘরে। সেই তাপে মনটাকে সেঁকতে চাইছিলেন অনুপমা। কথা খুঁজছেন,

—মনে পড়ে কি পাগলের মতো ফুটবল খেলতে তোমরা ওপাশের মাঠটায়?

চোখের মণিতে কোনো ভাবান্তর ঘটল না লোকটার— হুঁ। ও-মাঠে তো এখন গাঁজার ঠেক হয়েছে।

আবার গোটা ঘর নিঝুম। আরও থমথমে। সেই গাঢ় থমথমে ভাব চেপে বসেছে অনুপমার বুকে। নীরবতাটা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ফাঁসের মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরছে। সেটা কাটাতেই বুঝি ফের বলে উঠলেন— সারাটাদিন তোমার কাটে কী করে?

আনমনে জামার পকেট থেকে নস্যির কৌটা বার করল সে।— কী জানি! কেটে তো যায়। বউদির সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করি। ক্বচিৎ কখনো দোতলায় গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি। নয়তো... নয়তো... টিভি ফিবি... রেডিয়ো...

অনুপমার মনে হল লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই দিনগুলোকে মনে আনতে পারছে না।

বউদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন— তোমাকে একটু চিনি কম দিয়েছি। দেখ ঠিক হয়েছে কি না।

অনুপমা কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালেন— ঠিক আছে। আমি চিনি কমই খাই। তুমি বরং তোমার দেওরকে দেখ। একসময় মোড়ের দোকানে বাজি রেখে রসগোল্লা খেত।

শীর্ণ গালে হাসি ফুটল কি একটু? অনুপমা বুঝতে পারল না।

বউদি বললেন, সেইজন্যই তো ওর হাইসুগার...

লোকটা কথা ঘোরাল। অনুপমার দিকেই তাকিয়েছে— তোমার নাতি নাতনি সব কত বড়ো হল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপমা বললেন— নাতি ক্লাস থ্রি। নাতনি ওয়ান।

বউদি বলে উঠলেন, ছেলের বউ যত্নআত্তি করছে।

অনুপমার বুকটা চিনচিন করে উঠেছে। খোকনের বউ এত শান্ত ভদ্র অথচ কী নিরুত্তাপ। কোনো কোনো সময়ে মনে হয় নিষ্প্রাণ অনুভূতিহীন একটা দমদেওয়া কলের পুতুল মাত্র। অসম্মান করে, না যত্ন আত্তি করে, নিজেই এখনও বুঝে উঠতে পারলেন না। মুখে বললেন, ভালো। ভালোই তো।

লোকটা খাটের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজের পাতা নিজের মনে উলটোচ্ছে এবার। যেন খবরের কাগজ নয়, কোনো এক অজানা শিলালিপির দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ নিপুণভাবে কাগজটাকে ভাঁজ করে সরিয়ে দিল।

বউদি খালি চায়ের কাপ নিয়ে নিলেন অনুপমার হাত থেকে— তোমরা কথা বলো। আমি এখখুনি আসছি।

কী কথা বলবেন অনুপমা? বলবেন, চারদিন আগে ফেয়ারওয়েলে এক ছাত্রীর গলায় গান শুনতে শুনতে মনটা হঠাৎ উলটোদিকে দৌড়েছিল। বলবেন সেই মুহূর্তে স্বামী নয়, ছেলে নয়, নাতিনাতনি নয়, এই লোকটার কথাই ভাঙা রেকর্ডের মতো করকর করে বাজছিল বুকের ভেতর? অথবা কোনো ছোটো বড়ো সুখ দুঃখের স্মৃতির কথা তুলবেন? অথবা সেই একমাত্র কথা, যেটা শুনতে আসা এই একচল্লিশ বছর পরে?

একসময় অনুপমা উঠে দাঁড়ালেন— চলি। বেশি দেরি করলে বাড়িতে ভাববে আমি বোধ হয় চাকরি ছাড়ার পর বিবাগী হয়ে যাচ্ছি।

লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখের হাবভাব একটু যেন শিথিল— বোসো বোসো। কেউ কিছু ভাববে না। সবে তো এখন সাড়ে এগারোটা।

—দেড়ঘণ্টা লেগে যাবে ফিরতে। নিজের কথাটা নিজের বুকেই ধাক্কা মারল অনুপমার। মাত্র দেড়ঘণ্টায় একচল্লিশ বছর আগে থেকে কি বর্তমানে ফিরতে পারে কেউ? বললেন, বউদিকে বলে দিয়ো আবার সময় পেলে আসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এখন তো তোমার সময়ই সময়। অঢেল সময়। ইচ্ছে করলেই চলে আসতে পার।

—তাই বই কী। সংসার নেই, নাতি নাতনি নেই, হুটহাট ঘুরে বেড়ালেই হল?

—অত সংসারে জড়িয়ে পোড়ো না অনু। লোকটার ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বরে এই প্রথম এক মায়াবী বিষণ্ণতার ছোঁয়া এসেছে। ঝপ করে বলে বসল, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। বলব?

অনুপমা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। একদৃষ্টে লোকটার চোখের কোণের শীর্ণ শিরাটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—কিছু মনে কোরো না অনু, একটা প্রশ্ন করছি। সমীরণবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকাপয়সা রেখে গেছেন তোমার জন্য?

অনুপমা থতমত মুখে বলে উঠলেন, তেমন কিছু না।

—তাহলে বলি, টাকাপয়সা যা পাবে, সাবধানে রাখবে। নিজের নামে। আবেগের মাথায় ছেলের হাতে তুলে দিয়ো না। দিলেই পস্তাতে হবে আমৃত্যু। আমার মতো।

অনুপমা কিছু বলতে পারলেন না। না-বলা কথারা একচল্লিশ বছর পরে দুমড়ে মুচড়ে তবে কি এ-রকমই একটা কেজো কথা হয়ে যায়? নাকি যে-কথা থেকে যায়, সে-কথা নিজে নিজেই মরে যায় একদিন?

অনুপমা বাইরে এসে ছাতা খুললেন। রোদ্দুরটা বড়ো চড়া।

অনেকটা পথ যেতে হবে আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিম চাঁদের আলো

মোবাইলে আবার শৌর্যর নাম্বারটা টিপল ঝুম। ধুস, সেই এক রেকর্ড! দা নাম্বার ইউ কলিং ইজ আউট অফ রিচ...! আশ্চর্য, কানপুরের মতো একটা শহরে সেলফোন ধরাছোঁয়ার বাইরে? উহুঁ, নির্ঘাত ব্যাটারি ডাউন। তা বলে চার চারটে দিন...! চার্জারটা কলকাতায় ফেলে গেছে নাকি? হতে পারে। হতেই পারে। আই.আই.টি.-তে চান্স পাওয়ার আনন্দে বাবুর যা তুরীয় দশা! আজব ছেলে, নতুন চার্জার তো কিনে নিতে পারে। কিংবা লোকাল বুথ-টুথ থেকেও তো একটা কল মারা যায়।

কী চরম ব্যাপকতামি! ঝুম একটা আগুনে শ্বাস ফেলল। আসলে বাবু এখন বিন্দাস বনে গেছেন। নয়া নয়া ইয়ার জুটছে তো, তাতেই মশগুল। কোথায় কে ঝুম কলকাতায় ছটফট করছে, ভাবতে ভারি বয়ে গেছে শৌর্যের। একেই বলে আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। চার দিনেই এই, চার মাস পরে কী হবে? মন থেকে ঝুম পুরোপুরি ডিলিট?

ল্যান্ডলাইন বাজছে। কোনো কেজো ফোন? নাকি ছোটোপিসি? দুপুরবেলাটা ছোটোপিসির ঘোঁট করার সময়। ঠাম্মার সঙ্গে। ঝুম কি গিয়ে তুলবে ফোনটা? এত সতেরো গণ্ডা প্রশ্ন করে ছোটোপিসি! এক্ষুনি হয়তো জেরা শুরু হবে ঝুম আজ কলেজ বাঙ্ক করল কেন, ক্লাস-টাস কেমন হচ্ছে, বিকেলে কী করবে ঝুম, সন্ধেয় কোথায় যাবে...!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাং ঝাং, ঝাং ঝাং। বেজেই চলেছে ফোন। ওফ, ঠাম্মা ধরে না কেন? খানিক অপ্রসন্ন মুখে ঝুম গিয়ে রিসিভারটা তুলল। বেজার গলা বলল— হ্যালো?

ওপারে এক বুড়োটে স্বর— আমি দুর্গাপুর থেকে ফোন করছি। আমার নাম নীলাম্বর রায়।

ঝুমের বলতে ইচ্ছে করল, তো? সামলে নিয়ে বলল— কাকে চান?

—আমি মানে... আমার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে সম্প্রতি একজনের সঙ্গে দেখা হল... তার কাছ থেকেই নম্বরটি পেয়েছি। আপনারা হয়তো তাকে চিনবেন ... সুরেন বাগচি....

টিপিকাল শুড্ডাদের স্বভাব। পয়েন্টে না-এসে প্যাঁচ মেরে মেরে কথা বলা। সুরেন বাগচি মানে ...বাবার সেই সুরেন মামা? হুঁ, ওরা তো বাগচিই!

ভাবনার মাঝেই ফের কাঁপা কাঁপা গলা, — সুরেনই আমায় কথায় কথায় বলল, ওর ডালিদি এখন নাকি টালিগঞ্জে থাকে। আমি তখন ভাবলাম...

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি ঠিক কী নম্বর চাইছেন বলুন তো?

কী কাণ্ড, থেমে থেমে তাদের বাড়ির নম্বরই তো বলছে লোকটা! ঝটিতি মগজটাকে একবার সার্ফ করে নিল ঝুম। গলা ঝেড়ে বলল, —আপনি কি আমার ঠাকুমার কথা বলছেন? মঞ্জুলিকা...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডালির তো ওটাই ভালো নাম। তা ডালি ...মঞ্জুলিকাকে কি এখন পাওয়া যাবে? একটু কথা বলতাম।

এত সংকোচ করে কেন? ঝুমের কেমন যেন ধন্দ জাগল। রিসিভারের মুখটা চেপে ধরে হাঁক পাড়ল, —ঠাম্মা, তোমায় একজন খুঁজছেন।

বোধ হয় শুয়ে ছিল মঞ্জুলিকা, কোমর চেপে এল ধীরেসুস্থে। ঝুমের তিয়াত্তর বছরের ঠাম্মা বাতের ব্যথায় বেশ কাতর ইদানীং, চলতে-ফিরতে তার সময় লাগে বেশ। কাছে এসে ভুরু নাচিয়ে নাতনিকে জিজ্ঞেস করল, —কে রে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাবের বদলে টেলিফোনটাই হাতে ধরিয়ে দিল ঝুম। সামান্য তফাতে গিয়ে অবলোকন করছে ঠাকুমাকে। প্রথমে জিজ্ঞাসা, তারপর বিস্ময়, ক্রমশ বদলে যাচ্ছে মঞ্জুলিকার মুখমণ্ডল। হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, কখনো-বা ঈষৎ উদাস, কখনো-বা ফোটে নিছকই কেঠো অভিব্যক্তি। একবার হেসেও উঠল খিলখিল, হুবহু কিশোরীর মতো। বকর বকর চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই। অবশেষে ফোন যখন ছাড়ল, মঞ্জুলিকা তখন হাঁপাচ্ছে।

দম নিতে নিতে টেরচা চোখে নাতনিকে দেখল মঞ্জুলিকা। ঠোঁট টিপে বলল, —ভাগ্যিস সুরেন দুর্গাপুর গিয়েছিল। নইলে নীলুদা ইহজীবনে আর আমার খোঁজই পেত না।

—নীলুদাটি কে, অ্যাঁ? ঝুম চোখ ঘোরাল, —তোমার বয়ফ্রেন্ড?

—দ্যুৎ, আমাদের সময়ে ওসব ছিল নাকি? তার ওপর আমরা থাকতাম মফঃস্বলে। সেখানে ও-রকম কিছু ভাবাভাবির উপায়ই ছিল না। মঞ্জুলিকা নরম করে হাসল, —নীলুদা ছিল আমাদের পাড়ার ছেলে। খুব মেধাবী। কলেজে পড়ার সময়ে প্রায়দিনই বাবার কাছে আসত, অঙ্ক-টঙ্ক বুঝতে। তখনই যা কথাবার্তা হত একটু-আধটু।

—কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে তো 'একটু-আধটু' মনে হচ্ছিল না! যা গলে গলে পড়ছিলে!

—আহা, বাপের বাড়ির দেশের লোকের গলা শুনে আনন্দ হবে না?

—ব্যাস, ওইটুকুই? ঝুট মৎ বোলো ঠাম্মা।

—না রে, সত্যি বলছি। আমাদের মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। মঞ্জুলিকা চোখ তিরতির কাঁপছে, —তবে নীলুদার মধ্যে একটু খ্যাপামি অবশ্য ছিল।

—কীরকম? কীরকম?

—কেমন করে যেন তাকাত। মঞ্জুলিকা ঢোক গিলল,— কিন্তু ওরা যে ছিল কায়স্থ। বাগচিবাড়ির মেয়ের ওপর নজর পড়েছে জানলে বাবা ওর পিঠের ছাল তুলে নিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ও। সেইজন্যই বুঝি তোমরা এগোওনি?

—বাজে বকিস না তো। এগোনো-পিছোনোর কথা আসে কোত্থেকে? মঞ্জুলিকা মৃদু ঝামরে উঠল। —নীলুদা কলেজ পাশ করে চাকরি নিয়ে চলে গেল সেই আসাম। এদিকে আমারও বিয়ে হয়ে গেল, চলে এলাম এই কলকাতায়। ব্যাস, আর চোরে-কামারে সাক্ষাত নেই।

—সে কী গো? তোমার বিয়ের আগে পরে কক্ষনো দেখা হয়নি?

—একবারই হয়েছিল। আমার তখন বিয়ের তারিখ ঘাড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস করছে। তারপর তো নীলুদা বাপ-মা-ভাইবোনকে নিয়ে, শান্তিপুরের পাট উঠিয়ে দেশান্তরীই হয়ে গেল পাকাপাকি। পরে তারও বিয়ে-থা হয়েছে, নিজের ঘরসংসার হয়েছে...। ছেলে নাকি জার্মানিতে থাকে। দুর্গাপুরে এখন শুধু কর্তা-গিন্নির বাস।

—ওয়াও! এত হিস্ট্রি জানা হয়ে গেল?

—বলল। শুনলাম।

—তোমার খবর কিছু জানতে চাইলেন না?

—সব আগেই শুনে নিয়েছে। সুরেনের কাছ থেকে। তোর দাদু কবে মারা গেল, তার কী হয়েছিল, তোর পিসিদের কথা, তোর বাপ-মার গল্প, কিছুই তার অবিদিত নেই। তোর চাকরি করা বাপ-মার তুইই যে সবেধন নীলমণি, সেটা পর্যন্ত জানে।

—বুঝলাম। ঝুম চোখ টিপল, —এখনও তোমার সম্পর্কে বেশ ইন্টারেস্টেড। তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তাই স্টাডি করে নিয়েছে।

ঠাট্টাটা যেন গায়েই মাখল না মঞ্জুলিকা। ঈষৎ দূরমনস্ক সুরে বলল, — সত্যি, নীলুদাটা এখনও পাগলই আছে।

—কেন? ঝুমের ভুরু জড়ো,— তোমায় নতুন করে প্রোপোজ করল নাকি?

—কী যে আবোল-তাবোল বকিস! বললাম না, দুর্গাপুরে তার এখন টোনাটুনির সংসার...! বলতে বলতে মাথা দোলাচ্ছে মঞ্জুলিকা। প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মগতভাবে বলল, —তবে হ্যাঁ, আমাকে বলেছিল একদিন-না-একদিন ফের আমাদের যোগাযোগ হবে। কথাটা শেষ পর্যন্ত ফলল তো। ফলিয়ে ছাড়ল তো। চুয়ান্ন বছর পর।

ঠাম্মার মুখে এক অপার্থিব হাসি দেখতে পাচ্ছিল ঝুম। হাসি তো নয়, যেন শীতল জ্যোৎস্না। ঝুমের চার দিনের বিরহ, অভিমান, অস্থিরতা, সব যেন জুড়িয়ে আসছিল। নিজের অজান্তেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থি

অফিস ফেরত আজ একবার গড়িয়াহাটে নেমেছিল রিনা। টুকটাক কিছু কেনাকাটা সারতে। বাড়ি ঢুকতেই তুষার বলল, —বোসো না, বোসো না, সোজা ওপরে চলে যাও।

রিনা থমকে গেল, —কেন?

—তোমার কল এসেছে। তিন তিন বার তলব পাঠিয়েছেন মাসিমা।

—সর্বনাশ, আজ আবার বুড়োবুড়িতে ফাইট?

—ইয়েস। জবরদস্ত। আমি যখন এলাম, তখন তো ধুন্ধুমার চলছে। একবার বুড়ো হুংকার ছাড়ে, তো একবার বুড়ি কাঁসি বাজায়। এই তো সবে ময়দান শান্ত হল।

—ও। ...তাহলে তো একটু পরে গেলেও চলে। মুখ-চোখ জল দিয়ে আগে ফ্রেশ হয়ে নিই।

—না না, ওসব পরে। বুড়ি এক্ষুনি আবার হানা দিল বলে। মিনিট পাঁচেক আগেও খোঁজ করে গেছে।

রিনা সামান্য বিরক্তই হল। সারাদিন খাটাখাটুনির পর খুচরো ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে? ধন্য এক বাড়িওয়ালা জুটেছে বটে! মাস ছয়েক ধরে তো দেখছে, ঝগড়া ছাড়া বুড়োবুড়ির আর যেন কোনো কাজ নেই। আর সেই ঝগড়া মোটেই বয়স্ক দম্পতির নিরীহ খিটিমিটি নয়, রীতিমতো পাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপানো কোন্দল। বুড়োর বয়স সত্তর বাহাত্তর হবে, বুড়িও না-হোক তেষট্টি চোষট্টি, দু-জনেই মোটামুটি শক্তসমর্থ, দায়দায়িত্বের বালাই নেই, টাকাপয়সাও যথেষ্টই আছে... কোথায় ঝাড়া হাত-পা মানুষ দিব্যি প্রেমসে দিন কাটাবে তা নয়, অষ্টপ্রহর দু-জনে বেয়নেট উঁচিয়েই আছে। এ একটা কিছু বলল, তো ও ওমনি গেঁথে দিল, আর ও কিছু বলল, তো এ সঙ্গে সঙ্গে টাঁ টাঁ টাঁ টাঁ টাঁ। রিনারই হয়েছে ফ্যাসাদ! ভাড়া নিতে আসার দিন থেকে তাকে যে কী চোখে দেখেছে বুড়োবুড়ি, প্রতিটি কলহে রিনাকেই হুইসিল বাজাতে ছুটতে হবে।

সিঁড়িতে চড়ার আগে রিনা বেজার মুখে তুষারকে জিজ্ঞেস করল, —আজ লড়াইয়ের টপিক কী?

—খোদাই জানে। তুষার মুচকি হেসে ঠোঁট উলটোল, —দেখো গে যাও, দুপুরে কে কোন পাশ ফিরে শুয়েছিল তাই নিয়েই হয়তো লেগেছে।

অসম্ভব নয়। দু-জনে কখন কী নিয়ে যে বাধে তার কোনো ঠিকঠিকানা আছে? এই তো গত সপ্তাহে বুড়ো মানিব্যাগ খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই নিয়ে কী কুরুক্ষেত্রই না বেধে গেল! অবশেষে রিনা গিয়ে বুড়োর বালিশের তলা থেকে উদ্ধার করল মানিব্যাগ। কিন্তু তার পরেও কি যুদ্ধ থামল? বুড়ো সমানে গজরে চলেছে, বুড়ি নাকি ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছিল! বুড়িরও চেঁচানির বিরাম নেই, বুড়ো নাকি নিজেই সরিয়ে রেখে নাটক করছে! কী জ্বালা, কী জ্বালা।

গুটি গুটি পায়ে রিনা উঠল দোতলায়। দরজা থেকেই দেখল, বাইরের ঘরে টিভি নীরব, সুধাময়ের দর্শন নেই, একা মমতা সোফায় আসীন, মুখখানা তোলো হাঁড়িকেও লজ্জা দেয়।

রিনা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,—কী হয়েছে মাসিমা?

মমতা গুমগুমে গলায় বললেন, —তুমি ডালহৌসি পাড়ায় চাকরি কর না?

—হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাছে তো?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—আমায় একটা ভালো উকিল দিতে পারো?

—উকিল নিয়ে কী করবেন?

—বধূনির্যাতনের মামলা ঠুকব। মমতার গলা ঝনঝনিয়ে উঠল, —আর সহ্য হয় না। ওই বজ্জাত লোকটা যা খুশি অত্যাচার চালিয়ে যাবে, এ আর আমি মুখ বুজে মেনে নেব না।

বিরক্তি ভুলে হেসে ফেলল রিনা। মুখ আপনার বোজা থাকে কি মাসিমা... বলতে গিয়েও গিলে নিল ঢক করে। হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল, —আজ আবার হলটা কী?

—পিটপিটেপনার একটা সীমা আছে। ওই লোকটা সব সীমা পেরিয়ে গেছে। শুনলে তুমিও মাথার ঠিক রাখতে পারবে না।

—তবু শুনি?

—সকালে বাবুর কোষ্ঠ সাফ হয় না বলে রাতে আজকাল দুধ-খই খাচ্ছেন। তারও কত তরিবত জান? কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ-টায় ফুটন্ত দুধ রাখতে হবে ডাইনিং টেবিলে। ছ-টা বাহান্নয় দুধে কলা পড়বে। সাতটায় খই। সাতটা সাঁইত্রিশে চিনি। সেই মণ্ড ঘুঁটে ঘুঁটে উনি গিলবেন ঠিক রাত সাড়ে আটটায়। এর একটার যদি কণামাত্র ব্যত্যয় ঘটেছে...

—ব্যত্যয়টা ঘটবে কেন শুনি? সন্ধেবেলা কোন রাজকার্যটা তুমি কর, অ্যাঁ? কাজ তো শুধু বসে বসে অখদ্যে সিরিয়ালগুলো গেলো।

—তাতে তোমার কী? তোমার বাপের কী?

—দেখলে? দেখলে আস্পর্ধাটা? লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাঁধতে সুধাময় ফেটে পড়লেন, —তুমি আমাকেও একটা উকিল দাও। আমিও ডিভোর্স কেস করব। এই মুখফোঁড় মেয়েছেলেটাকে যদি শেষজীবনে ফ্যা ফ্যা করে না রাস্তায় ঘোরাতে পারি, তো আমার নামও সুধাময় মুখুজ্জ্যে নয়।

—তার আগে নিজে তো জেলের ঘানি ঘুরিয়ে এসো। রস তো মরুক। মমতা খিঁচিয়ে উঠলেন, —লোকটা যে কী ত্যাঁদড় তুমি জানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নীচস্য নীচ, শুধু নিজের সুখ-আরামটুকু বোঝে। দুধে কলা পড়তে বোধ হয় দশ সেকেন্ড বিলম্ব ঘটেছিল...

—মিথ্যে কথা। পাক্কা দু-মিনিট।

—নয় দু-মিনিটই হল, নয় পাঁচ মিনিটই হল... তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? সামান্য ওই কারণে তুমি টিভির প্লাগ খুলে দেবে?

—দেবই তো। এক-শো বার দেব। হাজার বার দেব। চিরকালের মতো তোমার টিভি দেখা আমি ঘুচিয়ে দেব।

—চেষ্টা করে দেখ। নোড়া দিয়ে হাত যদি না ভেঙে দিয়েছি...

নতুন করে শুরু হয়েছে গুলি ছোড়াছুড়ি। গোলগাল মমতা সোফা থেকে ফুঁসে ফুঁসে উঠছেন, রোগা ঢ্যাঙা সুধাময় পা ঠুকছেন মেঝেয়। রিনা হাসবে? না কাঁদবে? এই যুযুধান দম্পতিকে ঠান্ডা করা কি সোজা কাজ! দু দু-খানা কাঁচাখেকো উকিলকে দু-জনের পায়ের কাছে এনে ফেলে দেবে, এমন একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে রিনা ছাড়া পেল এ যাত্রা। তাতেও অবশ্য শঙ্কাটা যায়নি, রাতেই আবার তেড়েফুঁড়ে রণভেরি বাজবে কিনা।

নীচে নেমে বুবলুর মুখোমুখি। কোচিং ক্লাস থেকে ফিরেছে ছেলে। রিনার মুখে আজকের বৃত্তান্ত শুনে তার কী খ্যাকখ্যাক হাসি। বয়ঃসন্ধির ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তুমি কিন্তু একটা দারুণ জব পেয়েছ মা। তবে খুব সাবধান, দুই পাগলের মধ্যে পড়ে কোনোদিন ঝাড়-ফাড় না খেয়ে যাও।

রিনা ছদ্ম কোপে চোখ পাকাল, ও কী ভাষা, অ্যাঁ? ওঁরা না তোমার দাদু-দিদার মতো! ওদের সম্পর্কে ওভাবে বলতে আছে?

—ভুলটা কী বললাম মা? পাগল ছাড়া কেউ অমন সিলি কারণে বক্সিং লড়ে?

তুষার খবরের কাগজ খুলে বসেছে। কুটুস করে ফোড়ন কাটল, করে রে, করে। তোর মাকে দেখে বুঝিস না?

তুষারকে ঈষৎ কটাক্ষ হেনে রিনা বলল, বেশি বয়েসে অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-রকম ছেলেমানুষ হয়ে যায়, বুবলু। কী করছে, কী বলছে, জ্ঞান থাকে না।

—কিন্তু মা... দাদাই-দিদুনের তো এ-রকমই বয়স। দাদু-ঠাম্মাও এদের চেয়ে কিছু ইয়ং নয়। খটাখটি তো তাদেরও লাগছে। এমন সিন ক্রিয়েট তো তারা করে না।

—সবাই কি এক ছাঁচে ঢালা হয় নাকি? এঁরা একটু অন্যরকম।

—কারেক্ট। তুষার ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কথাটাকে। বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, আমাদের বাড়িওলা-বাড়িউলি হচ্ছে মাথায় ক্যারাওয়ালা কাপল। এমনি ঠিক আছে, কিন্তু একবার পোকা নড়লেই সমূহ বিপত্তি।

—তাই তো দেখছি। রিনা হাসল, —কিন্তু পোকাটা নড়ে কেন বল তো? তাও আবার এত ঘন ঘন?

—এটা বুঝলেই তো ব্যামো সারে। তুষার হো হো করে হেসে উঠল, পাড়ার লোক কী বলে জান? সুধাবাবুর বাড়িতে কাক-চিল পর্যন্ত ঘেঁষে না, আপনারা টিকতে পারবেন তো? আপনাদের আগের জন তো নিজেরা বাড়ি করে পালিয়ে বাঁচল।

—সত্যি, কোনো আত্মীয়স্বজনকে তো বড়ো একটা আসতে দেখি না!

—কে এদের ছায়া মাড়াবে, বলো? কার দায় পড়েছে? তুষারের হাসিতে এবার ব্যঙ্গ,— সেদিন সেলুনের লোকটা বলছিল, এখন নাকি বুড়োবুড়ির ফর্মা অনেক ডাউন, ফাইটিংয়ে তেমন জোশ নেই। আগে নাকি লিটেরালি মারপিট হত। মেসোমশাই নাকি একবার মেরে মাসিমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেও নাকি মাসিমা দমেননি, বঁটি নিয়ে তাড়া করেছিলেন মেসোমশাইকে। চোখের সামনে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে, এই ভয়ে মোড়ের জিতেনবাবু নাকি পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলেন, বাকিরা বলেকয়ে তাঁকে আটকায়।

এই কিসিমের গল্প রিনার কানেও এসেছে কিছু কিছু। মমতা-সুধাময়ের মধ্যে নাকি কেউ ভালোবাসার চিহ্ন দেখেনি। না যৌবনে, না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবয়সে, না এখন। মাঝবয়সি সুধাময়কে শীতের রাত্তিরে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়েছেন মমতা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বউকে অশ্রাব্য গালিগালাজ ছুড়ছেন সুধাময়, কিংবা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে দু-জনেই ফুটপাথে, এহেন দৃশ্য মোটেই বিরল ছিল না।

রিনার কেমন যেন ধন্দ জাগে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ঠিক যে ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে মারদাঙ্গা চলে, সুধাময়-মমতাকে কি সেই গোত্রে ফেলা যায়? সুধাময় যথেষ্ট শিক্ষিত মানুষ, ভালো চাকরিবাকরি করতেন, কোনো এক বহুজাতিক সংস্থায় ডেপুটি ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। এত রাগ-মেজাজ নিয়ে সুধাময় অফিস চালাতেন কী করে? মমতাও কলেজের গণ্ডি পেরোনো মহিলা, রিনাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যথেষ্ট মধুর, বুবলুকে ডেকে এটা খাওয়াচ্ছেন, ওটা চাখাচ্ছেন... দজ্জাল ঝগড়ুটে হিসেবে তাঁকে কি ভাবা যায় তখন?

যাক গে, মরুগ গে, অত ভাবাভাবির কী দরকার! থাকুন ওঁরা যেমন খুশি, রিনার বোধ হয় নিজেকে বেশি না-জড়ানোই ভালো। ডাকলেই ছুটতে হবে তার তো কোনো মানে নেই, এড়িয়েও তো থাকা যায়। নয় কী?

তা চাইলেই কি সবসময়ে সরে সরে থাকা সম্ভব? সুধাময়-মমতার মুষ্টিযুদ্ধ নিয়মিতই চলছে, রিনারও ডাক পড়ছে হরবখত, পাঁচ বার কাটিয়ে হাজিরও হতে হচ্ছে এক আধবার। নিজে থেকেও এগোতে হয় কখনো-সখনো। উপায় থাকে না যে। এক রোববার হঠাৎ দোতলা থেকে সবজি-বৃষ্টি শুরু হল। আলু পড়ছে, পেঁয়াজ পড়ছে, ঝিঙে পড়ছে ঢ্যাড়শ পড়ছে... সঙ্গে তুমুল হইহল্লা। হাঁ হাঁ করে রিনা ওপরে ছুটল, হচ্ছেটা কী মাসিমা?

—সব ফেলে দেব। টান মেরে ফেলে দেব। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত-পা ছুড়ছেন মমতা, —এমন কুচুকুরে লোক... আমি খেতে চেয়েছি বলে কিছুতেই আজ কুমড়োফুলটা আনল না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কুমড়োফুল আমি ফোটাব নাকি? গাছে তা দিয়ে দিয়ে? সুধাময় গাঁকগাঁক করে উঠলেন, যা এনেছি খাবে। নইলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকো।

—বটে? দেখি কোন হারামজাদি আজ তোমায় রেঁধে খাওয়ায়!

—যাও, যাও। সুধাময় মুখুজ্জ্যে কারোর পরোয়া করে না। হোটেল থেকে খেয়ে আসব।

—এসো খেয়ে। তারপর যদি তোমাকে সেঁকো বিষ না-গেলাই, তো এই মমতা এক বাপের বেটি নয়।

বলেই ঘরে ঢুকে দড়াম। গোঁসাঘর আর সেবেলার মতো খুললই না। অগত্যা নিজেদের রান্না থেকে খাইয়ে আসতে হল সুধাময়কে। খেতে খেতেও তড়পাচ্ছেন সুধাময়, দেখে নেব। কাল আস্ত কুমড়ো এনে যদি মাথায় না-ভাঙি...

আর একদিন তো তুষারকেও ছুটতে হল দোতলায়। ইচ্ছে করে নাকি নিজের শাড়ির সঙ্গে সুধাময়ের পাঞ্জাবি কাচতে দিয়েছিলেন মমতা, পাড়ের রং উঠে সবজে সবজে ছোপে ভরে গেছে সাদা পাঞ্জাবি, রেগে কী-একটা নাকি গাল পেড়েছিলেন সুধাময়, অমনি মমতা ফ্যাড়ফ্যাড় করে পাঞ্জাবিটাই ফেঁড়ে দিয়েছেন। ক্রোধে উন্মাদ সুধাময় স্থির করেছেন, আর এই মেয়েমানুষের সঙ্গে নয়, আজই তিনি ইহজীবন শেষ করবেন। ফাঁস বানানোর দড়িও পাকাতে শুরু করেছিলেন সুধাময়। নেহাত ছুটির দিন ছিল বলে রক্ষে, ঠিকে কাজের মেয়েটি এসে খবর দিতে তুষার গিয়ে কোনোক্রমে সামাল দিল পরিস্থিতি।

তা এইভাবেই চলছিল দিন। নাটক, অতিনাটক, মেলোড্রামা, সেমি ট্র্যাজেডি, স্থূল কমেডি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে। তুষার-রীনাদেরও গা-সওয়া হয়ে আসছিল ক্রমশ। দোতলার কোনো ধরনের উত্তেজনাতেই আর হেলদোল হয় না তেমন। বড়োজোর টিভির আওয়াজ খানিক বাড়িয়ে দেয়, অথবা দরজা-জানলা বন্ধ করে কোরাসে প্রার্থনা জোড়ে, কবে এই হুহুংকার থামবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ একদিন বাড়াবাড়িটা চরমে উঠল। দিনে নয়, রাত্রিবেলা। খাওয়া-দাওয়া সেরে, খানিক টিভি-ফিবি দেখে সবে শুয়েছে রিনারা, তখনই বিপুল বিক্রমে জেগে উঠল দোতলা। প্রথমে ঠুং ঠাং, তারপর ধুম ধড়াস। কী পিলে চমকানো আওয়াজ রে বাবা, মিসাইল-ফিসাইল ছুড়ছে নাকি? পলকের জন্য মমতার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উড়ে এল, পরক্ষণেই সুধাময়ের উল্লাসধ্বনি। অচিরেই নিনাদ অবশ্য বদলে গেল হা হা রবে, বেজে উঠেছে পিশাচিনীর খলখল।

রিনা ভয়ে ভয়ে বলল, —আজ একটা ভয়ানক কিছু হয়েই যাবে মনে হচ্ছে!

—হোক গে। এসপার-ওসপার হয়ে যাওয়াই উচিত। তুষার পাশ ফিরে শুল, তুমি একদম উঠবে না।

—তা বললে কি হয়? খুনোখুনি হয়ে গেলে পুলিশ এসে তো আমাদেরও টানাটানি করবে।

—না না, অদ্দূর গড়াবে না। এই দেখ না, থামল বলে।

তুষারের বাক্যটুকু শেষ না-হতেই ফের প্রবল ঝনঝন। এমন আওয়াজ, গোটা বাড়ি যেন কেঁপে উঠল। বড়ো আয়নাটা ভাঙল নাকি? মাসিমা কুঁইকুঁই কাঁদছেন যেন? চোট পেয়েছেন?

তুষারও বোধ হয় ওইরকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছে। ভার ভার মুখে বিছানা ছেড়ে বলল, আর কী, চলো। ডিউটিতে নেমে পড়ি।

ওপরে গিয়ে রিনার চক্ষুস্থির। সাধারণ লড়াই-ঝগড়া নয়, এ যেন মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়েছে দোতলায়! ঘরদোর বিশ্রীরকম ছত্রাকার, সত্যি সত্যিই বড়ো আয়নার কাচ ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়। দেখে মনে হয় দুটো প্রবীণ মানুষ নয়, একজোড়া পাগল হাতি দাপাদাপি করে গেছে ঘরখানায়।

মমতা হাঁটু চেপে কোঁকাচ্ছিলেন। রিনাদের দেখে হাউমাউ করে উঠেছেন, এক্ষুনি পুলিশ ডাকো। লোকটা আমায় মেরে ফেলছিল।

পুরোনো আমলের ডিভানের ভেতরে পড়েছিলেন সুধাময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে বসে বললেন, আসুক পুলিশ। দেখে যাক মেয়েছেলেটার কীর্তি।

রিনা ধমকে উঠল, আহ, রাতদুপুরে কী ছেলেমানুষি শুরু করেছেন? হয়েছেটা কী?

—তোমার মেসোমশাইকে জিজ্ঞেস করো উনি কী করেছেন!

—কিছু করিনি। সানাইয়ের পোঁ না-ধরলেই অমনি মহারানির মেজাজ।

তুষার রাগত স্বরে বলল, ভ্যানতাড়া ছাড়ুন তো। ঝেড়ে কাশুন।

দাবড়ানিতে কাজ হয়েছে। সুধাময় চোখ পিটপিট করে বললেন, তোমার মাসিমার ছোটো ভাই... জন্মে সে দিদির খোঁজ নেয় না, হঠাৎ দিদির ওপর পিরিত উথলে উঠেছে। তার মেয়ের বিয়ে, পেয়ারের দিদিকে নাকি যেতেই হবে বিয়েতে। তাও কাছেপিঠে নয়, সেই বেনারস। আমাকে টিকিট কেটে আনতে বলেছিল... টিকিট পাইনি...

—বাজে কথা। মিছে কথা। শয়তানটা ইচ্ছে করে টিকিট কাটেনি। নিজে ঘর ছেড়ে নড়বে না, কারোর সঙ্গে মিশবে না, আমাকেও কোত্থাও যেতে দেবে না। চিরটাকাল এ-রকম।

—কী হয় লোকের সঙ্গে মিশে, অ্যাঁ? কূটকচালি শেখা ছাড়া? সুধাময় খাড়া হয়ে বসলেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই টিকিট কাটিনি। বেশ করেছি। কী করবে তুমি, অ্যাঁ?

—দেখবে কী করব? মেঝেতে ভর দিয়ে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালেন মমতা। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি বেনারস যাবই, এক্ষুনি বেরোব। গিয়ে হাওড়া স্টেশনে বসে থাকব।

—চেষ্টা করে দেখো! পায়ের গোছ ভেঙে রেখে দেব। তোমার ফুর্তি মারতে যাওয়ার বাসনা আমি চিরতরে ঘুচিয়ে ছাড়ব।

স্থানকালপাত্র ভুলে তুষার এবার চেঁচিয়ে উঠেছে, আপনারা থামবেন? যা প্রাণ চায় করুন আপনারা। অন্তত রাত্তিরটা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিনাও তালে তাল ঠুকল, বুঝতে পারছেন কী, আপনারা দু-জন মিলে আমাদের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছেন? এর পর তো আমাদেরই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।

মমতা-সুধাময় থমকেছেন যুগপৎ। একটু পরে সুধাময় মিনমিনে স্বরে বললেন, তোমার মাসিমা আমায় সারাক্ষণ খোঁচায় বলেই না...

—আমি খোঁচাই, না তুমি? মমতা সঙ্গেসঙ্গে ফোঁস, সারাটা জীবন আমায় দগ্ধে দগ্ধে মারল...

—চুপ। আর একটাও কথা নয়। তুষার ফের ধমক দিল —যান, দু-জনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আর টুঁ শব্দটি নেই। স্বামী-স্ত্রী সুড়সুড় ঢুকে গেলেন শোয়ার ঘরে। দু-পাঁচ মিনিট দেখে রিনারাও পায়ে পায়ে ফিরেছে একতলায়।

বিছানায় এসে রিনা বলল, সত্যি, আর পারা যাচ্ছে না। জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেল! কী ধাতু দিয়ে যে বিধাতা গড়েছিল এঁদের!

তুষার বলল, আমার কী মনে হয় জান? বাচ্চা-কাচ্চা নেই তো দু-জনের, তাই কোনো বন্ধনই তৈরি হয়নি।

—ছেলেপুলে হয়নি বলে এঁদের কোনো দুঃখবোধ আছে কী? আমার তো মনে হয় না।

—উঁহু, আমরা হয়তো টের পাই না। ওই শূন্যতাই হয়তো ঝাঁঝ হয়ে বেরোয়।

—কী জানি বাপু, অনেকেরই তো বাচ্চা হয় না, তারা কি সর্বক্ষণ এ রকম আঁচড়া-আঁচড়ি করে? যদি কেউ কারোকে একটুও না সহ্য করতে পারে, তাহলে একসঙ্গে থাকা কেন?

—হয়তো লাঠালাঠি করার জন্যই। তুষার বড়ো করে একটা হাই তুলল, যাক গে, আজকের রাতটা মনে হচ্ছে মানে মানে উতরে গেল। তবে এ-রকম চললে অঘটনের আর কিন্তু দেরি নেই।

তুষারের ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। অঘটন একটা ঘটল বটে, তবে একদম অন্যভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ বিবাদটির পর ওপরতলা ক-দিন ঠান্ডাই ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না বিশেষ। রিনাদের একটু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। দোতলার হল্লাগুল্লায় কান এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, নীরবতায় কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বুবলু পর্যন্ত ঠাট্টা করে বলছে, বাড়িটায় আর যেন প্রাণ নেই মা!

এমনই এক সময়ে, হঠাৎই মাঝরাতে সিঁড়ির দরজায় গুমগুম। রিনা ঘুম চোখে ছিটকিনি খুলতেই ওপারে মমতা, তোমরা একটু ওপরে চলো তো।

—কেন মাসিমা? কী হল?

—তোমাদের মেসোমশাই যেন কেমন করছে। সুবিধের ঠেকছে না।

রিনারা সবাই পড়ি-মরি করে ছুটল ওপরে। গিয়ে দেখে সুধাময়ের রীতিমতো বেহাল দশা। মুখ বেঁকে গেছে, দৃষ্টি ঘোলাটে, বিছানায় নেতিয়ে থাকা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে হঠাৎ হঠাৎ।

বুঝতে অসুবিধে নেই, সেরিব্রাল স্ট্রোক। এবং মস্তিষ্কের চোটটি বেশ মোক্ষম।

তুষার-বুবলু ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গেছে, রিনা বসল মমতার পাশে। উদ্‌বিগ্ন স্বরে বলল, কখন এসব হল মাসিমা?

মমতার চোখে কোনো ভাষা নেই। বিড়বিড় করে বললেন, খাওয়াদাওয়ার পর তো ঠিকই ছিল। বারান্দায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল, যেমন থাকে রোজ। তারপর তো এসে শুয়েও পড়ল। তখনও তো পুরো স্বাভাবিক। আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট আগে বাথরুম যাওয়ার জন্য উঠেছিল, বেরোল কেমন টলতে টলতে। তারপর বিছানায় এসে হঠাৎ খিঁচুনি...।

বেশ গুছিয়ে বলছেন মমতা। নিরাবেগ স্বরে। রিনা রীতিমাফিক আশ্বস্ত করতে চাইল মমতাকে। পিঠে হাত রেখে বলল, ঘাবড়াবেন না মাসিমা। সময় বেশি গড়ায়নি, এক্ষুনি ট্রিটমেন্ট শুরু হচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হলেই মঙ্গল। আয়ু থাকলে বাঁচবে, না-থাকলে চলে যাবে। তুমি আমি ভেবে কী করব!

রিনা বড়োসড়ো একটা ঠোক্কর খেল। এই বিপন্ন মুহূর্তেও কোনো স্ত্রী এমন অবিচল থাকতে পারে? সম্পর্ক যেমনই হোক, এতকালের সঙ্গী তো বটে!

অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা না-করে সুধাময়কে তোলা হল স্ট্রেচারে। বিপদসংকেত বাজাতে বাজাতে রওনা দিল অ্যাম্বুলেন্স। রাতের অন্ধকার চিরে।

তিন তিনটে দিন কী দৌড়োদৌড়িই না গেল! সুধাময়ের এক-আধজন আত্মীয় হাসপাতালে এসেছিল, তবে তারা কম্মের নয়, তুষার-রিনারই ধকল গেল বেশি। ওষুধপত্র কেনা, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা, নার্সকে ম্যানেজ করে মাঝে মাঝে আই. সি. ইউ.-তে গিয়ে সুধাময়কে সরেজমিন করে আসা...।

আস্তে আস্তে ফাঁড়া খানিকটা কাটল। জ্ঞান ফিরেছে সুধাময়ের, পরিচিতদের চিনতেও পারছেন যেন, কিন্তু মুখের ভাষাটি কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। স্বরযন্ত্র বিকল হয়নি, তবে কথা বলতে গেলে দুর্বোধ্য কিছু শব্দ বেরিয়ে আসছে শুধু। ডাক্তাররা বলছেন, মগজের যে অংশটি ভাষার সুসংগতি রক্ষা করে, সেই জায়গাটুকু সাময়িকভাবে অকেজো এখন। কবে ঠিক হবে, আদৌ হবে কি না, কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মমতা রোজই আসছেন হাসপাতালে। কখনো একা, কখনো রিনার সঙ্গে, আবার কখনো বুবলু নিয়ে আসছে তাঁকে। সুধাময়ের কেবিনে ঢুকে একটাও কথা বলেন না মমতা, নিঃশব্দ বসে থাকেন বিছানার পাশের টুলটায়। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে দেখেন স্বামীকে। সেই দৃষ্টিতে কোনো মায়া নেই, কমনীয়তা নেই, বিষাদ নেই, উৎকণ্ঠা নেই যেন। আছে শুধু অবিশ্বাস মাখা বিস্ময়। যেন ভেবেই পাচ্ছেন না, তাঁর কুঁদুলে বরটা কী করে এমন শান্ত হয়ে গেল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন বিকেলে এক অভিনব দৃশ্য অপেক্ষা করছিল রিনার জন্য।

অফিসফেরতা এসেছিল রিনা। কেবিনে তখন নার্স নেই, মমতা একাই বসে। সুধাময়ের বিছানার পাশে টুলটায়।

দরজা থেকেই রিনা শুনতে পেল সুধাময়ের অর্থহীন স্বর, ডা ডু ডা ডা ডু ডা...।

অমনি মমতা জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন মুখের কাছে। দু-চার ঢোক জল খেয়ে সুধাময় তৃপ্ত।

রিনা দাঁড়িয়েই আছে দরজায়। দেখছে বিদঘুটে স্বামী-স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা। সুধাময় অস্থির আবার। রোগা, লম্বা শরীরখানা নড়াচড়া করছে বিছানায়। স্বরযন্ত্রে ফের ধ্বনি ফুটল, ডু ডা ডু ডি ডা ডু ডা ডু...।

সুধাময়ের মাথার বালিশখানা সামান্য ওপর দিকে তুলে দিলেন মমতা। সঙ্গেসঙ্গে কমে গেল সুধাময়ের অস্থিরতা।

রিনার পা গেঁথেই আছে দ্বারপ্রান্তে। চিত্রার্পিতের মতো।

এবার সুধাময়ের চোখ ঘুরছে এদিক-ওদিক। টাগরায় জিভ ঠেকিয়ে ফের শব্দ বাজালেন, ডি ডু ডু ডা ডু ডা...।

সুধাময়ের গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে দিলেন মমতা। আশ্চর্য এক স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল যেন, আরামে চোখ বুজলেন সুধাময়।

রিনা স্তম্ভিত। রিনা বিমোহিত। এঁরাই নাকি পরস্পরের ভাষা বোঝেননি কোনোদিন? অকারণে আক্রমণ শানিয়ে গেছেন জীবনভর?

ভুল, একদম ভুল। বিদ্বেষই বুঝি এক বিচিত্র বন্ধন গড়ে দিয়েছে, যা ওই অবোধ্য শব্দরাজিকেও কিনা পড়তে শেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিনুক খোঁজার বেলায়

ঢেউ-এর পর ঢেউ পেরিয়ে ক্রমশ ভেতরদিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। এক-একটা দস্যি ঝাপটাকে সামাল দিতে-না-দিতেই ছুটে আসছে আরেকটা। ভেজা বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে জলের সঙ্গে ওদের হুটোপুটি দেখছিলেন মাধুরী। তুতুন সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরে আছে নীলাঞ্জনকে। ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলাঞ্জন খুব বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ওর কোমর ধরে লাফিয়ে উঠছে জলের মাথায়। তুতুনটা অবশ্য তাতেও তাল রাখতে পারছে না। লাফাতে গিয়ে এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছে সময়। নোনাজলে নাকানিচোবানি খাচ্ছে বার বার। এইমাত্র একটা বড়োসড়ো ঢেউ ফুলে উঠে ডুবিয়ে নিল ওদের। টানটান হয়ে উঠল মাধুরীর শরীর। মেয়েটা ঠিক ঠিক নীলাঞ্জনকে ধরে রাখতে পেরেছে তো? টলমলে জলে চকিতে একটা পুরুষ-শরীর ভেসে উঠতে দেখলেন শুধু। তুতুন কোথায় গেল? ছটফট করে উঠে দাঁড়ালেন মাধুরী। নাঃ। ওই তো তুতুন। নিজের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে তিনি দেখলেন বুকের খুব কাছে তুতুনকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়েছে নীলাঞ্জন। তুতুনও দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওর গলা। সেভাবেই তুতুনকে ধরে রেখে আবার একটা ঢেউ-এর মাথায় ভেসে উঠল নীলাঞ্জন। হঠাৎই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলেন মাধুরী। মেয়ে-জামাই-এর এসব রঙিন একান্ত মুহূর্তগুলোর মধ্যে মোটেই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা উচিত নয়। পায়ের কাছ থেকে তোয়ালে, জামাকাপড় তুলে নিয়ে ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। বিশাল অর্ধবৃত্তাকার অংশ জুড়ে শুধু জল আর জল। নীলচে সবুজ জল গড়াতে গড়াতে একেবারে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে ঘন নীল। কিছু দামাল ঢেউ পেরিয়ে গেলেই সমুদ্র কী অদ্ভুত রকমের গাঢ় আর গম্ভীর। মাঝসমুদ্রে কোনো কোনো ঢেউ-এর মাথায় মুক্তোর মুকুটের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে এক ঝলক ধবধবে ফেনা। দূরে কালো বিন্দুর মতো জেলেদের নৌকাগুলো টিপটিপ। সী-হক উড়ছে রুপালি রোদ্দুরে। মাধুরী এগিয়ে পা ছোঁয়ালেন জলে।

দেবতোষের সঙ্গে বহু আগে একবার পুরী বেড়াতে এসেছিলেন। তুতুন তখনও হয়নি। মেয়ের মতোই জলকে ভয় পেতেন তিনি। দেবতোষ জোর করে টেনে জলে নামিয়ে নিয়েছিলেন। শাড়ির আঁচল আঁট করে কোমরে গোঁজা। তবু বার বার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলেন। হাসতে হাসতে দেবতোষ সামলে দিচ্ছিলেন তাঁর কাপড়। মানুষটার সবল দু-হাত চেপে একটু একটু করে এগোচ্ছেন তিনি। দুরন্ত জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে বুকে, কোমরে। ঢেউ এগিয়ে এলেই দেবতোষ বলছেন—লাফাও। পায়ের তলা থেকে সর সর সরে যাচ্ছে বালি। ডুবন্ত বালিতে সজোরে পা চেপে তিনি হাঁপাচ্ছেন, আর না। আর ভেতরে যাব না। চওড়া কাঁধ, ঈষৎ তামাটে রং মানুষটি হাসছেন হা-হা করে, এত ভয়? আরেকটু ভেতরে চলো। দেখবে কত ভালো লাগবে।

প্রথমদিন স্নান করার পরই অবশ্য গা ছমছম ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তারপর থেকে যে ক-দিন এখানে ছিলেন রোজ নামতেন সমুদ্রে। ঢেউ-এর দোলায় দুলে দু-জনে চলে যেতেন অনেকটা ভেতরে। সকালের জলখাবার খেয়ে জলে নামতেন, উঠতেন মাথার ওপর সূর্য উঠে গেলে।

সুখের মুহূর্তগুলো বড়ো তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়। যে-মানুষটার একটা দিনও তাঁকে ছাড়া চলত না, সে-ই চলে গেল হুট করে। কেন যে পৃথিবীতে এত মায়া, প্রেম, বন্ধন? মনটা হু হু করে উঠল মাধুরীর।

অন্যমনস্কভাবে আরও একটু জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেনায় ভিজে যাচ্ছে শাড়ির পাড়। এদিকে লোকজন বিশেষ স্নান করে না। আরও এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। সমুদ্র থেকে একটা মানুষ উঠে আসছে। ভীষণ চেনা চেনা যেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন। চঞ্চল ঢেউ টপকে টলমলে পায়ে এগিয়ে এল মানুষটা। আরও কাছে আসতে চিনতে পারলেন। সুখময়!

আড়চোখে তাঁকে একবার দেখে নিয়েই সুখময় চলে যাচ্ছেন।

নিজের অজান্তেই ডেকে ফেললেন মাধুরী।

সুখময়ের কয়েক সেকেন্ড লাগল চিনতে, আরে মাধুরী! তুমি এখানে?

—কাল এসেছি। মাধুরী লক্ষ করলেন তাঁকে দেখতে দেখতে রীতিমতো জিজ্ঞাসু হয়ে উঠছে সুখময়ের চোখ-মুখ।

—আমি ভাবতেও পারছি না। সুখময় ঢোক গিললেন, কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল বল তো?

—বোধ হয় পঁচিশ বছর। ভারি সুন্দর হাসলেন মাধুরী, কী খবর তোমার? কেমন আছ?

ভেজা পাজামা লেপটে আছে শরীরে। খোলা বুকে দানা দানা জল। পাতলা কাঁচা-পাকা চুল নেতিয়ে পড়েছে। কত আর বয়স হয়েছে সুখময়ের? তারই তো সমবয়সি। এর মধ্যেই বড়ো বেশি বুড়োটে মেরে গেছে সেদিনের সেই নরম যুবকটি। মাধুরীর তাকানো লক্ষ করে অপ্রস্তুত ভাবে হাসলেন সুখময়,

—দাঁড়াও একটু। ভিজেটা আগে বদলে আসি।

এখান থেকে কোনাকুনি তুতুন আর নীলাঞ্জনকে দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় দু-জনের শরীর মিশে এক হয়ে গেছে। বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ একাকার হয়ে যাচ্ছে চরাচরে। হাওয়া থেকে আঁচল টেনে মাধুরী ভালোভাবে জড়িয়ে নিলেন গায়ে,

—ওই যে আমার মেয়ে জামাই। তুতুন আর নীলাঞ্জন।

—তোমার মেয়ে এত বড়ো হয়ে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হবে না? বি.এ. পাশ করার পরই তো হয়েছে। মাধুরী জোরে হেসে উঠলেন, এই তো গত শ্রাবণে ওদের বিয়ে হয়েছে। এখানে বেড়াতে আসবে, আমি বললাম, তোরা যা, আমায় নিয়ে আবার টানাটানি কেন? জামাই কিছুতেই শুনল না। জোর করে ধরে নিয়ে এল।

—তোমার ওই একটিই মেয়ে?

—হুঁ। মাধুরী অন্যমনস্ক, দেবতোষ বছর পাঁচেক হল আচমকা স্ট্রোকে মারা গেছে।

সুখময় সমুদ্রের নীলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। মাধুরীরও অল্প সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে, এবার তোমার খবর বলো। একা এসেছ?

—না। স্ত্রী-র শরীর খারাপ। চেঞ্জে নিয়ে এসেছি। স্বর্গদ্বারের দিকে বাড়ি ভাড়া করে আছি দিন পনেরো হল।

হাত থেকে জামাকাপড়ের ব্যাগটা বালিতে পড়ে গেল। নীচু হয়ে তুলতে কিছু সময় নিলেন মাধুরী,

—ছেলে-মেয়েদের আনোনি?

—মেয়ে নেই। দুই ছেলে আমার। কলকাতায় বউদির কাছে আছে।

—ও...

—তুমি এখন থাক কোথায়?

—যেখানে আগে থাকতাম তারই কাছাকাছি। ম্লান হাসলেন মাধুরী, মেয়ে একটু বড়ো হওয়ার পর একটা স্কুলে টিচারি পেয়েছিলাম। এখনও করছি। আমার বাপের বাড়ির কাছাকাছি দেবতোষ একটা ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছিল। আমার নামে। তুতুনের বিয়ে হয়ে যাবার পর একা একাই থাকি। বাপের বাড়ির সবাই অবশ্য দু-বেলা খোঁজখবর নেয়। চলে যাচ্ছে বেশ।

সমুদ্রের ভেজা নিশ্বাসে ওঁদের চোখ-মুখে নোনতা বাষ্প জমছে। মাধুরী লক্ষ করলেন বেশ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে সুখময়ের মুখ। তিনি কি বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন? বুক বেয়ে এত বেশি দীর্ঘশ্বাস উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে কেন? কোনো মানে হয় না। নিজেকে সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, চলো। ওরা বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ জলে থাকবে। তোমার স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপ করে আসি।

—যাবে তুমি? সুখময় ঝুঁকলেন, ওর শরীরটা অবশ্য বিশেষ ভালো নেই।

—কী কষ্ট?

—হাঁপের টান।

—দাঁড়াও আমি বরং ওদের বলে আসি। তুমিও এসো। ওদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মাধুরী থমকালেন সামান্য। হঠাৎ তিনি সুখময়ের সঙ্গে যেতে চাইলেন কেন! তবে কি এই মুহূর্তে সুখময়ের সাহচর্য চাইছেন! নাকি যে-মানুষটা এক সময় তাঁর জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রিয়া কেমন দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না!

সুখময় বললেন, তোমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হয়ে কী ভালো যে লাগছে...

মাধুরী মনে মনে বললেন, আমারও খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা সুখময়, কলেজের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তোমার?

পরিচয়পর্ব সারা হওয়ার পর ভদ্রমহিলা নিজের অসুখ, সংসার আর স্বামীর গল্প শুরু করেছেন। অস্বস্তি কাটাতে উঠে দাঁড়ালেন সুখময়, মাধুরী তুমি একটু চা খাবে? বাইরে থেকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে।

—নিয়ে আসতে পারি কি? নিয়ে এসো। সুখময়ের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সুখময় বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজার দিকে তাকিয়ে বড়ো একটা নিশ্বাস ফেললেন সুখময়ের স্ত্রী,

—আপনার বন্ধুটিকে নিয়ে আর পারি না ভাই। সারাক্ষণ আমার অসুখ নিয়ে এত পুতুপুতু করেন। যত বলি বয়স হয়েছে এখন আর এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধকল সইবে না, কে শোনে কথা। আমার হাঁপের টান উঠলে উনিও সারারাত জেগে বসে থাকবেন। আমায় ফেলে কোথাও একা যেতে চান না। আমিই দু-দিন জোর করে সমুদ্রে পাঠাচ্ছি।

মাধুরীর বুকটা সামান্য খচ খচ করে উঠল। মুখে তবু আলগা হাসি ফোটালেন,

—আপনার যা শরীর, সুখময়ের উচিতই তো আপনাকে সবসময় কম্পানি দেওয়া।

—আহা, সব কিছুর তো একটা সীমা আছে। আপনিই বলুন, হাঁপানি রোগে কেউ তাড়াতাড়ি মরে? মাঝে মাঝে এমন আদিখ্যেতা করে, লজ্জায় মরে যাই।

ভদ্রমহিলা একটু নির্লজ্জ প্রকৃতির। নইলে একজন সদ্য পরিচিতের সঙ্গে কেউ এসব কথা আলোচনা করে? মাধুরী মনে মনে বিরক্ত হলেন। ভদ্রমহিলা তাঁকে বেশি বেশি করে শোনাতে চাইছেন না তো? মাধুরীর চেয়ে বয়েসে ছোটো। তবুও তো বয়স কম হয়নি।

চা খেয়ে আর বসলেন না। সুখময় তাঁকে হোটেল অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার পর তুতুন খিলখিল হেসে উঠল, মা, এই সেই তোমার নীরব প্রেমিক?

নীলাঞ্জন ভাঁজভাঙা পাঞ্জাবি পরেছে ফিরে এসে। ঘন চুল পাটে পাটে সাজানো। এতক্ষণ জলে থাকার দরুন একটা সতেজ ভাব এসেছে মুখে। মাধুরী আড়চোখে জামাইকে দেখে নিয়ে সলজ্জ হাসলেন।

—এই জান, মা যখন কলেজে পড়ত না, তখন এই ভদ্রলোক মার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে মা তখন বাবার প্রেমে মশগুল। মা-র বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ভদ্রলোক ওই কলেজ ছেড়ে অন্য কোথায় যেন চলে যান।

নীলাঞ্জন মুচকি হাসল, ভদ্রলোককে দেখেই খুব ইমোশনাল মনে হয়।

তুতুন হেসে গড়িয়ে পড়ল, বাবাঃ, তুমি এত স্টাডি করেছ? আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন কেমন বোকা বোকা লাগছিল। কীরকম আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন দেখেছিলে?

—আঃ তুতুন। মাধুরীর ভুরু কুঁচকে উঠল, বড়োদের সম্পর্কে ওভাবে কথা বোলো না।

দুপুরে একা ঘরে শুয়ে ঘুম এল না মাধুরীর। সমুদ্রে স্নান করেননি আদৌ। তবু সমুদ্র-স্নানের ক্লান্তি সারাশরীরে। পাশের ঘরে তুতুন আর নীলাঞ্জন ঘুমোচ্ছে। তুতুনটা এখনও সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেল। ডাইনিং হলেই ঢুলতে শুরু করেছিল। খেয়ে এসে আর একমুহূর্ত দেরি করেনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। একা একা বাইরের বারান্দায় বসে ছিল নীলাঞ্জন। মাধুরীও কিছু পরে গিয়ে বসেছিলেন পাশে।

সামনের এই টানা বারান্দাটাতে এলেই একেবারে মুখোমুখি নীল সমুদ্র। খাঁ খাঁ করছে সোনালি তটভূমি। রোদের ঝাঁঝ আজ যেন বড়ো বেশি। সূর্য তার সব উত্তাপ উজাড় করে দিচ্ছে সমুদ্রকে। এত উত্তাপেও কিন্তু নিজের কোমল শীতলতা হারাচ্ছে না সাগর। মাঝে মাঝেই আঁচলা ভরে ঠান্ডা বাতাস পাঠিয়ে দিচ্ছে এদিকে। বড়ো ভালো লাগছিল বসে থাকতে। টুকটাক কথার ফাঁকে সিগারেট টানছিল নীলাঞ্জন। পোড়া তামাকের মেজাজি আমেজ ছাড়াও নীলাঞ্জনের শরীর থেকে ভীষণ চেনা একটা পুরুষ-গন্ধ এসে লাগছিল মাধুরীর নাকে। দেবতোষের শরীরেও ঠিক এই ধরনের গন্ধ পেতেন। এলোমেলো বাতাসে নীলাঞ্জনের রেশম চুল উড়ছে এদিক-ওদিক। চেয়ারের হাতলে সবল হাত পড়ে আছে অলসভাবে। দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস। আর একটু হলেই কনুই অবধি সাদা পাঞ্জাবি গোটানো রোমশ সেই তামাটে হাতে হাত রাখার প্রলোভন তিনি কিছুতেই সামলে উঠতে পারতেন না। কী যে আজকাল হয় তাঁর! মায়াবী যুবকটিকে যখন তিনি চুরি করে দেখছিলেন বার বার তখনই ঘর থেকে তুতুনের ঘুম জড়ানো আহ্লাদি গলা ভেসে এসেছিল, অ্যাই, তুমি কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যাও, যাও, তুমি শুয়ে পড়ো। শশব্যস্তে তখনই উঠে পড়েছিলেন মাধুরী।

ছি! ছি! এসব কী আবোল-তাবোল পাগলামি আজ ভর করছে তাঁকে? অদ্ভুত শূন্যতা, নিঃসীম এক আকুতি ভেতরে জেগে উঠতে চাইছে বার বার। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকলেন তিনি। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখ বুজে বিছানা হাতড়ালেন। কাউকে খুঁজছেন যেন। কলকাতায় হাজার কাজের মধ্যে ডুবে থাকার জন্যই কি নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে হয় না? নাকি আজ সুখময়দের দেখে বুকের ফাঁকা জায়গাটায় কাঁটার খোঁচা লাগছে? বার বার কে যেন হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে বুকে, বাতিল। বাতিল। তুমি এখন বাতিল।

সত্যি কি তবে বাতিল হয়ে গেছেন তিনি? জীবন থেকে? সময়ের ওঠাপড়া থেকে? কোনো মানুষ কি কোনোদিন বাতিল হতে চায়? একেবারে বাতিল? একা? নিঃসঙ্গ? খাট থেকে নেমে ঢক ঢক জল ঢাললেন গলায়। ঘাড় গলা ঘামে ভিজে সপসপে। একটু বাইরের হাওয়ায় যাওয়া দরকার। নিঃশব্দ পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। নীলাঞ্জন শোওয়ার আগে ভালোভাবে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। অজানা জায়গা, অচেনা মানুষজন... দু-হাতে মুখ থেকে চুল সরাতে সরাতে দরজাটা ভালোভাবে টেনে দেওয়ার জন্য এগোলেন। হাওয়ার ঝাপটায় পর্দার টুকরো অংশ পত পত উড়ছে। মাধুরী ছিটকে সরে এলেন। নীলাঞ্জনের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে তুতুন। আর ওর মাথায় গভীর আবেগে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নীলাঞ্জন।

মাধুরীর বুক ধড়ফড় করে উঠল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। দেবতোষও ঠিক ওইভাবে বিলি কেটে দিতেন চুলে! পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজনের বুকে শুয়ে নিজেকে যে কী সুখী মনে হয়! কী পরিপূর্ণ! দেবতোষের সঙ্গে সুখময়ের মুখটাও বার বার ভেসে উঠছে কেন চোখের সামনে? তার সঙ্গে আরেকটা মুখও এসে যাচ্ছে পাশাপাশি। ছোটোখাটো চেহারার ফ্যাকাশে, রুগ্ণ এক মহিলার মুখ। সুখময়েরও হয়তো আর সেই আগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো দুর্বলতা নেই। সংসার আর সময়ের পলিতে চাপা পড়ে গেছে সব। কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা কি কোনোদিন ফুরিয়ে যায়?

আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। তুতুন আচমকা গলা জড়িয়ে ধরায় জেগে উঠলেন, মাগো, তুমি রাগ করেছ? মাধুরী চোখ বুজে হাসলেন, কেন রে?

—দেখ না, ও তখন থেকে আমায় বকছে। বলছে বড়োদের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলে কেউ?

—ঠিকই তো বলেছে। মাধুরী মেয়ের কপালে হাত রাখলেন।

—বা রে, আমি তো অন্য কাউকে বলতে যাইনি। তোমাকেই বলেছি।

মাধুরী মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আঃ। এই তো শান্তি।

—মা। তুতুন কান্নাভেজা গলায় ডাকল, বাবাও আজ আমাদের সঙ্গে থাকলে কত ভালো হত, না?

মাধুরীর বুক নিংড়ে ভারী নিশ্বাস গড়িয়ে এল। তুতুনের চোখের কোণে চিকচিক করছে জল।

—মা, তোমার খুব একা লাগে, না?

—দুর পাগলি। শুধু শুধু মন খারাপ করছিস কেন? মাধুরী ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

দরজায় উঁকি দিল নীলাঞ্জন, বেশ একা একা মা-র আদর খাওয়া হচ্ছে...

—তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি? তুতুন খরখরিয়ে উঠল।

—তা তো একটু হচ্ছেই। নীলাঞ্জনের চোখে দুষ্টু হাসি।

—এসে যাও তাহলে। আমার মা অত কিপটে নয়। তোমাকেও ভালোবাসবে।

মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাঁটুর কাপড় নামালেন, তোরা দুটোতে রাতদিন যে কী খুনসুটি করিস...

—দেখুন না মা আপনার মেয়ে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—দেখ না মা তোমার জামাই...

মাধুরী দিদিমণিদের মতো দু-হাতে কান চাপা দিলেন, হয়েছে, হয়েছে। যাও এবার দু-জনে চা-টা খেয়ে একটু বেড়িয়ে এসো।

—আপনি যাবেন না?

—আমার বড্ড মাথা ধরেছে নীলাঞ্জন। সকালে রোদ লেগে গেছে। একটু বিশ্রাম নিতে চাই।

তুতুন নীলাঞ্জন দু-জনেই ব্যস্ত হল, খুব শরীর খারাপ লাগছে?

মাধুরীর হাসি ভিজে গেল মমতায়,

—ব্যস্ত হবার মতো কিছু নয়। তোমরা যাও বেড়িয়ে এসো। তুতুন তোর গাঢ় নীল পিয়োর সিল্কটা পরে বেরোস আজ।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর একা বারান্দায় এসে বসলেন মাধুরী। মাথাটা এখন বেশ হালকা লাগছে। অনেকক্ষণ একভাবে বসে রইলেন। সময়ের মনে সময় সরে গেল। একটু একটু করে বহুরূপীর মতো রং পালটাল সমুদ্র। পূর্ণিমার চাঁদ সোনার চাঁদোয়া বিছিয়ে দিল গাঢ় নীল জলের বুকে। হিরের কুচির মতো দূরে চিকচিক করছে সাদা ফেনা। সমুদ্র তার সব তাপ, গভীরতা আর ঔদার্য বাষ্প করে পাঠিয়ে দিচ্ছে বুঝি। শরীর মন জুড়িয়ে গেল। কী প্রশান্তি। রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। সমুদ্র তাঁকে যেন নতুন করে জীবনের মানে বুঝিয়ে দিল। কিছুই হারায় না। বাতিল হয়ে যায় না। মিছেই তিনি সারাটা দুপুর ছটফট করে মরলেন। ভালোবাসা, সুখ, তৃপ্তি সবই ফিরে আসে নতুনভাবে। কখনো তা উদ্দাম, উচ্ছল, আবার কখনো গাঢ় গভীর তন্ময়তায় আচ্ছন্ন। ঠিক এই বিশাল জলরাশির মতো।

খাওয়াদাওয়ার পর রাতে যখন মাধুরী আবার বারান্দায়, তুতুন নীলাঞ্জন এসে বসল পাশে,

—আপনাকে কিন্তু কাল সমুদ্রেই নামতে হবে। নীলাঞ্জন শিশুর চপলতায় হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না বাবা। আমার বড়ো ভয় করে।

—ভয় কী? আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

হঠাৎ মাধুরী অবিকল দেবীর ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন, আর আমাকে ও-কথা বোলো না নীলাঞ্জন। দুরন্ত ঢেউ-এর পাগলামিকে সত্যি আমার বড়ো ভয় । থাক ওসব কথা। তোমরা আজ কোথায় বেড়ালে বলো।

—অনেক দূর অবধি আজ হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিলাম সমুদ্র ধরে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বিকেলের গল্প বলে চলে তুতুন, ওমা তোমাকে তো বলাই হয়নি। তোমার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সঙ্গে স্ত্রীও ছিলেন। ইস কী রোগা, ফ্যাকাশে চেহারা। কথা বলতে বলতে তুতুন সকালের মতোই ভেঙে পড়ল হাসিতে, না মা। এখন আর তোমার জন্য তেমন প্রেম নেই। স্ত্রী-র পিঠে হাত রেখে দারুণ রোমান্টিকভাবে হাঁটছিলেন।

নীলাঞ্জন দু-পা ছড়িয়ে দিয়েছে রেলিং-এর ওপর, কাল সকালেই এখানে আসবেন বলেছেন। আমাদের সঙ্গে সমুদ্রে নামবেন। উনিই তো বললেন আপনাকেও জলে নামানোর কথা।

মাধুরীর বুকটা কেঁপে উঠল। তুতুন আচমকা গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর, ও মা, না বোলো না। সবাই মিলে বেশ অনেকটা ভেতরে চলে যাব। তোমার কিছু ভয় নেই মা। ও তোমাকে ঠিক ধরে থাকবে।

—ও যদি আমাকে ধরে, তবে তোকে কে সামলাবে রে পাগলি? মাধুরী হেসে ফেললেন।

তুতুন আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, কেন ওই ভদ্রলোকও তো থাকবেন। উনি আমার মধ্যে সেই আগের তোমাকে খুঁজে পেয়েছেন বোধ হয়। বিকেলেও আমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। আমাকে উনিই ঠিক সামলে ভেতরে নিয়ে যেতে পারবেন।

তুতুন বড়ো ফাজিল হয়ে যাচ্ছে উঠেছে। মাধুরী লক্ষ করলেন বউকে থামানোর জন্য নীলাঞ্জন বার বার চোখ পাকাচ্ছে। সামাল দিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতাড়ি, কত ভেতরে যেতে পারবি তোরা? নীলাঞ্জন, তুমি কতটা নিয়ে যেতে পার?

—সত্যি সত্যি নামবেন আপনি? নীলাঞ্জনের চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল। গাঢ় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বড়ো রহস্যময় হাসলেন মাধুরী, যারা সমুদ্রের তীরে স্নান করে তারা কখনোই ততটা গভীরে যায় না নীলাঞ্জন। তোমাদের দু-জনকেই আজ একটা কথা বলি শোন। সমুদ্রের যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছেই। ভেতরে যাও দেখবে কী গভীর আর শান্ত হয়ে থাকে সমুদ্র। অথচ জল কিন্তু একই। যেখানে ওই আকাশ এসে মিশেছে সাগরে সেখানে কী অদ্ভুত প্রশান্তি।

তুতুন নীলাঞ্জন কেউই মাধুরীর এই আচমকা আবেগের মানে খুঁজে পাচ্ছে না। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মাধুরী গভীর চোখে বললেন, তোমাদের নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে। যাও, শুয়ে পড়ো।

পরদিন খুব ভোরে, সূর্য যখন সমুদ্র থেকে উঠে আসেনি, গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে আছে আকাশ, সমুদ্র, বিশ্বচরাচর তখন মাধুরী উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। আরও কিছু পরে তুতুন নীলাঞ্জন তাঁকে ঘরে না-পেয়ে খুঁজতে বেরোল। অনেক দূর থেকে একসময় তারা দেখতে পেল সিল্যুটের মতো ছায়া ছায়া মাধুরীকে। আপন মনে ভেজা বালি থেকে একটার পর একটা ঝিনুক তুলতে তুলতে মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছেন জলের খুব কাছাকাছি। ওরা তাঁকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। গড়ানে আকাশের গায়ে সূর্যটা তখন আবার নতুন করে আলো ছড়াতে শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ বছর বয়স

কলেজ থেকে ফিরেই আশ্চর্য চিঠিটা পেল ঝিনুক। এক টুকরো আকাশের মতো ঝকঝকে নীল খাম। তার গায়ে তারার মতো ছড়িয়ে তার নাম-ঠিকানা। কে রে বাবা। হাতের লেখাটা মোটেই মেয়েদের নয়। উঁহু। ভাস্কর, মধুবন কিংবা অরিজিতেরও নয়। ওদের হ্যান্ডরাইটিং ঝিনুকের চেনা। তাহলে! আশপাশের কোনো বীরপুঙ্গব আবার লাভ লেটার দিল নাকি? হতেও পারে। ও-রকম স্টুপিড কিছু চিঠি প্রায়ই পায় ঝিনুক। বিশ্রী ভাষায়। ভুল বানানে। অনেক সময়ে ছেলেগুলোকে ধরেও ফেলে। ওফ। তখন তাদের কী করুণ অবস্থা। তাড়াখাওয়া জার্মান স্পিৎজের মতো লেজ গুটিয়ে ছুট ছুট। হাসিও পায়...।

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু অন্যমনস্কভাবেই খামের মুখটা ছিঁড়েছে ঝিনুক। যেই না ছেঁড়া, অমনি আসল কালপ্রিটটি তড়াক করে লাফিয়ে একেবারে বাইরে। আরে এ যে সায়ন! সায়ন মিত্র। এ-বছর ফাইনাল-অ্যাপিয়ার্ড। উইথ ইকো অনার্স। হায়ার সেকেন্ডারির নাইনথ বয়। এবং বিশ্বের এক নম্বর ফাজিল ক্লাবের পাণ্ডা। কিন্তু সায়ন তাকে হঠাৎ চিঠি দিতে গেল কেন? মতলব কী? ঝিনুক ভালো করে চিঠিটা চোখের সামনে ধরল, ...লিভিং ক্যালকাটা। বোধ হয় ফর এভার। অন অক্টোবর টোয়েন্টি সেকেন্ড ...ব্যস। মাত্র তিনটেই লাইন। টেলিগ্রাম স্টাইলে। ডেট-ফেটের বালাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়া বড়ো দাদুসাইজের ফুলস্ক্যাপ কাগজের মধ্যিখানে খুদি খুদি লেটারগুলো টিপটিপ করছে। যেন বে-অফ-বেঙ্গলে বিন্দু বিন্দু কিছু জেলে-নৌকো। তারপর একদম নীচে প্রায় তিরের কাছে এসে গড়ানো ঢেউ, —উনিশটা দশে ফ্লাইট। আসবি একবার? ডোমেস্টিক লাউঞ্জে? তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। মাইরি।

টোয়েন্টি সেকেন্ড মানে কাল। ঝিনুক কয়েক সেকেন্ড থমকে রইল। চিঠিটা কি সিরিয়াস? হুস। হতেই পারে না। রোজই তো আড্ডা মারছে এসে ক্যান্টিনে। পরশুও একতলা থেকে হাত নাড়ল। ঝিনুক অবশ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অ্যাজ ইউস্যুয়াল। এর মধ্যে কথা নেই, বার্তা নেই দুম করে একটা 'চলে যাওয়া' আসে কোত্থেকে? এ নির্ঘাত সায়নের কোনো নতুন ফর্মে লেগপুলিং। সবসময় কারুর-না-কারুর পিছনে লেগে আছে। মেয়েদের না-খ্যাপালে ভাত হজম হয় না। যত চটে মেয়েরা, ওর তত মজা। প্লেজার। সব থেকে মজা বোধ হয় ঝিনুককে খেপিয়ে। সেই ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম দিন থেকে...।

ঝিনুক সজোরে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। চেহারাটা একটু হ্যান্ডসাম আর লেখাপড়ায় চোখা হলেই কি সব থেকে স্মার্ট হওয়া যায়? কক্ষনো না। স্মার্টনেসটা ভেতরকার ব্যাপার। তার জন্য অত পসচার মারার দরকার হয় না। চিঠিও লিখতে হয় না কায়দা মেরে। ঝিনুককেই-বা কী ভেবেছে ও? মুরগি? না রাস্তার পাগলি? যখন-তখন এসে টিজ করবে? এই তো লাস্ট উইকে ওকে করিডরে দেখে তড়াং করে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে। সরে যাওয়ার আগেই মেডিয়াভাল নাইট হয়ে এসে গেছে হাঁটুর কাছে। তারপরে যাত্রাদলের কেষ্টর মতো সে কী গলা কাঁপানোর ভান, —হাই মেরিলিন। আবার এসেছি আমি। তব চরণতলে। সেই অভাগা গ্যারি কুপার।

—আমি ধন্য হয়েছি। ঝিনুকও ভেংচে উঠেছে সঙ্গেসঙ্গে, রাস্তা ছাড়। ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ছাড়ব। তার আগে তুই আর একবারটি আমাকে সিডিউস কর। মনরো স্টাইলে। সেদিনের মতো। প্লিইইজ।

ফাস্ট ইয়ারের ছেলে-মেয়েগুলোও ভিড় জমিয়ে হ্যা হ্যা হাসছে। যেন দারুণ কমিক সিন দেখাচ্ছে সায়ন। কেষ্ট মুখার্জির প্রেম নিবেদন! ওফেলিয়াকে!

ঝিনুক ভীষণ রেগে গিয়েছিল, দেখ, তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি। লাগতে হলে রাস্তায় গিয়ে অন্য মেয়েদের পেছন লাগ। আমার সঙ্গে একদম...

—যাহ বাবা, পেছনে লাগছি কোথায়? সায়ন সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানতে শুরু করেছে ফ্রেশারগুলোকে, —তোরাই বল। আমি অবসিন করেছি কিছু?

কথা বলার ভঙ্গি দেখে ঝিনুকের বন্ধুরাও হেসে লুটোপুটি। সুকন্যা, তনিমা, শবনম।

ধারালো রাগে ঝিনুক ঝমঝম এগিয়ে গেছে —এই চলে আয় তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কলেজছাড়া ক্লাউনটাকে দেখলেই হবে? ক্লাস করবি না? বি কে জি এতক্ষণে বোধ হয়...

কাকে গালাগাল দেওয়া! নির্লজ্জ ছেলেটা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে—এই ঝিনুক দাঁড়া, যাস না। শোন শোন...

—তোর কথাটা তোর পকেটে রেখে দে।

—বিশ্বাস কর, ইয়ার্কি না। তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা ছিল। রিয়েলি। সুকন্যাদের ছাড়িয়ে সায়ন আবার মুখোমুখি— ক্লাস শেষ হলে ক্যান্টিনে একবার আসিস। প্লিজ। কথা দিচ্ছি বোর করব না।

আহ্লাদ রে। উনি ডাকলেই যেন ঝিনুক হ্যাল হ্যাল করে ছুটে আসবে! অত খায় না। ঝিনুকের চোখ দুটো দপদপ করে উঠল। চিঠিটা টান মেরে ফেলে দিল টেবিলের উপর। জুতো জোড়া এক লাথিতে দরজার কোণে। ওয়ার্ডরোবের পাল্লা থেকে হাসছে জর্জ মাইকেল। উজ্জ্বল চোখ। হাতে গিটার। সেদিকে কটমট তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দেবে নাকি লোকটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ গেলে? কিংবা চোয়ালে এক ঘুসি? ...না, না, না, তোমাকে মারতে যাব কেন? আমার সুনুমুনু।

ঝিনুকের মুখ নিবু নিবু হয়েও জ্বলে উঠেছে। উঃ কী শয়তান ছেলে। কথায় জ্বালিয়ে মন ভরেনি। এবার চিঠি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এমন টাইট দেব যে বাছাধন পালাবার পথ পাবে না। আবার ন্যাকা ন্যাকা করে লেখা হয়েছে— তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে! দেখাচ্ছি। এমন দেখা দেখাব...। ঝিনুক ভয়ানক আক্রোশে হ্যান্ডব্যাগখানা আছড়ে দিল মেঝেতে। তারপর ঝাঁঝালো গলায় চেঁচিয়ে উঠল —মাআআআ। অনেকক্ষণ এসেছি আমি। এখখুনি খেতে দাও। পেট জ্বলে যাচ্ছে।

দুই

সাততলার উপর ঝিনুকদের এই ফ্ল্যাটটা বেশ নিরিবিলি। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক নির্জন দ্বীপ। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে এ-রকমই একটা অনুভূতি জাগে ঝিনুকের। বিশেষ করে রাত্রিবেলা। মনে হয় একটা গাঢ় নীল সমুদ্রে একদম আলাদা হয়ে যেন ভেসে রয়েছে। বাবা। মা। আর সে। ব্যালকনি থেকে ওপরতলা নীচতলা কিছুই দেখা যায় না। শুধু অনেকটা নীচে রাস্তাটা পড়ে থাকে সমুদ্রতলের মতো। সমুদ্রের কি তল দেখা যায়? বোধ হয় না। তবু ঝিনুকের ও-রকম মনে হয়। মনে হয় যেন জলের অনেক গভীরে গাড়িঘোড়াগুলো জলজীবদের মতো সাঁতার কাটছে। আর মানুষগুলো হয়ে গেছে পোকা, কাঁকড়া, জেলিফিশ, স্টারফিশ। গুড়গুড় করে ঘুরছে এদিক সেদিক। হাত পা নাড়ছে। দেখতে দেখতে ঝিনুকের মনটা যেন কেমন গলে যেতে থাকে। গলতে গলতে একটা একা নদী হয়ে যায়। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। বাবা ফেরে অনেক রাতে। মা-ও মাঝে মাঝে বাড়ি থাকে না। তখন কেবল সে আর শোভামাসি। রাতদিনের কাজের লোক। আর একগাদা ইকনমিক্সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই। ক্যালকুলাস। কিংবা সিডনি শেলডন, অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, লুডলাম। কখনো-বা হেমিংওয়ে, মোপাসাঁ, লরেন্স। আজ অবশ্য মা বাড়িতেই। ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছে। খুব জোরে অ্যাড-এর গান বেজে চলেছে। প্রতিশ্রুতি শুরু হবে। মা দু-একবার উঁচু গলায় ডাকল তাকে— ঝিনুক, আরম্ভ হচ্ছে রে। দেখবি তো আয়।

নাহ, ঝিনুকের আজ কিছু ভালো লাগছে না। সিরিয়ালও না। বিকেলের রাগটা পাকতে পাকতে কখন নিটোল একটা মন খারাপ হয়ে গেছে। কেন সে নিজেই জানে না। শবনম একটু আগে ফোন করেছিল— এই, কাল নন্দনে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে যাবি? কলেজের পর? আঙ্কল টিকিট এনেছে। ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল— না রে, কাল অন্য কাজ আছে।

কেন বলল কথাটা? ইডিয়টের মতো? তবে কি তার সাবকনশাস মন এয়ারপোর্ট যাবে ভাবছে! কাল! আশ্চর্য! নিজেকে বুদ্ধু, হাঁদা, বোকার ডিম বলে গালাগালি দিতে ইচ্ছে করছে। সায়নের চিঠিটা হঠাৎ বিশ্বাস করে ফেলছে কেন? হয়তো ছেলেটা কোথাওই যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই ফলস। হয়তো দেখতে চায় সত্যিই ঝিনুক যায় কি না। তাহলে পিছন পিছন গিয়ে রাস্তাতেই বেশ অপদস্থ করা যাবে। কমিক সিন ক্রিয়েট করে মজাসে হো হো হাসবে। অসম্ভব, সায়ন মিত্র বিশ্বাসের উপযুক্ত নয়। ভাবতে গিয়ে নিজের চিন্তায় নিজেই বিরক্ত ঝিনুক। যাওয়ার প্রশ্নটা আসে কী করে? ধরে নেওয়া যাক সায়ন সত্যি সত্যি চলে গেল, তাতেই-বা কী আসে যায়? বরং একটা আপদ নামবে ঘাড় থেকে।

মাথার ওপর হাত ছড়িয়ে আলগা আড়মোড়া ভাঙল ঝিনুক। ফালতু চিন্তা না-করে ম্যাথস নিয়ে বসা দরকার। এস. এম.-এর নোটটাও ফেয়ার করতে হবে। ব্যালকনি ছেড়ে ঝিনুক নিজের ঘরে ফিরল। দরজা দিয়ে ঢুকতেই সোজাসুজি ছোটো আলমারির গায়ে ইমরান খান, রবি শাস্ত্রী আর বরিস বেকার। তিনজনই ঝিনুকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ঝিনুক মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওই লোকগুলোকেও এখন অসহ্য লাগছে। ছেলেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু হ্যান্ডসাম হলেই কী যে ভাবে নিজেদের! সঙ্গে গুণফুন থাকলে তো কথাই নেই। ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। করুক গে। স্নব কোথাকার! ঝিনুকও কারুর থেকে কম যায় না। রূপে, গুণে। ওদের যদি অহংকার থাকতে পারে, ঝিনুকই-বা কম কীসে! খাট ঘুরে জানলার ধারে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সঙ্গেসঙ্গে বেলজিয়ান গ্লাসে টলমল এক সদ্যযুবতী। যুবতী নয়, মাত্র এই সন্ধে বেলায় ফোটা দোলনচাঁপা। ফর্সা নরম শরীরে হালকা গোলাপি আভা। স্টেপকাট চুলে শ্রাবণের মেঘ। পালক পালক চোখের পাতা। পাতা ছুঁয়ে ভুরু। ঝিনুক ব্রাশ তুলে চুলে কয়েকটা টান দিল। দিয়েই আবার এলোমেলো করে দিয়েছে। ন্যাচারাল শাইন লিপস্টিক ঠোঁটের কাছে এনেও নামিয়ে রাখল। নানারকম মুখভঙ্গি করল আয়নায়। বার তিনেক নিজেকে জিভ ভ্যাংচাল। খোলা বন্ধ করল নাইটির বোতাম। উনিশ বছরের যৌবনটাকে আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। মাগো মা, কী তাড়াতাড়ি দিন কেটে যায়। কবে যে এমন একটা বড়োসড়ো মহিলা হয়ে গেল সে! অথচ ভাবলে মনে হয় এই সেদিনকার কথা। এই তো ক-দিন আগে মাধ্যমিক দিল। দেখতে দেখতে হায়ার সেকেন্ডারি। ফার্স্ট ইয়ার। তারপর এই সেকেন্ড ইয়ার-এর শুরু।

হুঁ। কলেজের প্রথম দিনটা ছবির মতো মনে আছে ঝিনুকের। অ্যাডমিশনের পর কমলিকা বলেছিল— ফার্স্ট দিনটা খুব অ্যালার্ট থাকবি ঝিনুক। তুই তো নিজেদের স্কুলে এইচ.এস. করেছিস, জানিস না কলেজে প্রথম দিন হেভি র‍্যাগিং হয়। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কলেজের বহুত ডিফারেন্স।

শুনেই ঝিনুকের সে কী বুক ধড়ফড়। হাঁটু কাঁপা। র‍্যাগিং শব্দটার ভেতরেই যে বাঘের মতো ঘাপটি মেরে থাকে একটা ভীষণ ভয়। কাগজে পড়েছে। শুনেওছে অনেকের মুখে। এই তো গত বছর সুকন্যার দাদাই পালিয়ে এসেছিল। পিঠে একগাদা কালশিটে নিয়ে। কী ভয়ংকর মেরেছিল বেচারাকে। শিরিনের দাদাকে নাকি ফুঁ দিয়ে একটা পয়সা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে বলেছিল বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। রাতে শুলেই গায়ে জল ঢেলে দিত। ...সে-রকম সাংঘাতিক কি কিছু হবে তার কলেজে? স্কুলের ছেলে-মেয়ে কলেজে গেলেই অ্যাত্ত পালটে যায়!

রীতিমতো এক বুক শঙ্কা নিয়ে কাঁপা পায়ে ক্লাসে ঢুকেছিল প্রথম দিন। ঢুকে ভিতু পাখির মতো এককোণে বসে চুপচাপ। কমলিকা, সুকন্যা, শবনমরাও ফ্যাকাশে। এমনকী ভাস্কর মধুবনরাও সময় গুনছে ঝড়ের। স্যার রোলকল শেষ করার সঙ্গেসঙ্গে হুড়মুড় ঢুকে পড়ল একপাল ছেলে-মেয়ে। কিছু সেকেন্ড ইয়ার। বেশির ভাগই থার্ড। রোগা হিলহিলে একটা মেয়ে স্যারের কাছ থেকে রেজিস্টার চাইল— প্লিজ স্যার, আজকের দিনটা।

কুড়িটা নতুন অনার্স স্টুডেন্টের হৃৎপিণ্ড তখন বন্ধ। প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে গাছেদের মতো নিস্পন্দ। স্যার চলে যেতেই প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়িয়েছে তিনজন। জাজদের মতো ভাবভঙ্গি। বাকিরা সামনে। উকিল পজিশনে।

—রোল নম্বর টোয়েন্টিওয়ান। সিদ্ধার্থ সরকার। উঠে এসো।

সিদ্ধার্থ গুটিগুটি পায়ে উঠে গেছে।

—কী রে, তুই গ্রাম থেকে আসছিস?

—গ্রাম নয়। ক্যানিং। সিদ্ধার্থ স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণ।

—ক্যানিং ইজ আ কাইন্ড অফ গ্রাম। কাম অন। ফিল্ম দেখিস?

সিদ্ধার্থ ঘাড় নাড়ল।

—রাম তেরি... দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—এখানে আয়। তোকে তিন মিনিট স্পিচ দিতে হবে। সাবজেক্ট— মন্দাকিনী ইন ক্যানিং লোকাল।

যাক। এমন তো কিছু সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা নয়! সুকন্যা আর ঝিনুক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল। ভয়টা প্রথম ধাক্কাতেই অনেকটা নেমে গেছে। তরতর করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—রোল থার্টি সিক্স, থার্টি সেভেন, থার্টি এইট একসঙ্গে উঠে আয়। সৈকত, তনিমা আর কমলিকা উঠল।

—মন দিয়ে শোন। সাপোজ তুই আর এ, ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ। অ্যান্ড শি ইজ দ্য লাভার। লাইক বচ্চন, জয়া আর রেখা। মনে কর, তুই একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলেছিস তোর হাজব্যান্ডকে। স্টার্ট দ্য ফাইট।

এ-রকমই সব বিটকেল মজার র‍্যাগিং। ঠিক র‍্যাগিং নয়, র‍্যাগিং-এর বোরখা পরে আলাপ-পরিচয়ের নতুন কৌশল। সুকন্যাকে তো পুরো গ্ল্যাক্সো বেবি অ্যাডটা গানের সঙ্গে অ্যাক্টিং করে দেখাতে হল। শবনম রামায়ণের সীতা আর ইন্দ্রনীল দারা সিং। এপিসোড— অশোকবন। লেজ সামলে হনুমান গদগদ বসে আছে মায়ের সামনে।

এভাবেই এক সময় ঝিনুকের পালা।

—বাহ, তোর ফিগারটা তো দারুণ।

ঝিনুক সলজ্জ হাসল।

থার্ড ইয়ারের শুভশ্রী তখনই প্ল্যাটফর্ম থেকে টেনে নামিয়েছে ছেলেটাকে। সিক্স ফিট টু-ফু হবে। চাংকি পাণ্ডে টাইপ মুখ।

—কী রে, একে পছন্দ হয়? আমাদের সায়ন।

সঙ্গেসঙ্গে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে ঝিনুক। নো ঘাবড়ানো। মুখে ভয়ের ছাপ দেখলেই এরা চেপে ধরছে। কিংবা বেশি চালাকদের।

—কী রে বল, হয় পছন্দ?

—মন্দ কী? ভালোই তো। মুহূর্তের অসাবধানে ঝিনুক বুঝি ওভারস্মার্ট।

—দেন থিঙ্ক হিম অ্যাজ গ্যারি কুপার। অ্যান্ড ইউ মেরিলিন মনরো। সিডিউস হিম।

মাগো, এ কেমন ধারার খেলা! ঝিনুক থতামত। তার বেলাতেই-বা এত কঠিন কেন!

—কী হল? স্টার্ট...

সকলে একসঙ্গে হইচই করছে। হাসছে হাততালি দিয়ে। তাকে ঘিরে। তার মধ্যেই সায়ন কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে ফিচেলমার্কা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি। অসহায় ঝিনুকের কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর হঠাৎই ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়েছে— আমি ওসব পারব না।

—পারবি না মানে?

—পারব না মানে পারব না।

শুভশ্রী খিলখিল করে হেসে উঠল— তবে কী পারবি তুই?

ঝিনুক চুপ।

—বি আ গুড গার্ল বেবি।

ঝিনুকের তবু ঘাড় ট্যারা।

—ঠিক আছে। ডু এনিথিং ইউ লাইক। উইথ দিস গ্যারি কুপার। অ্যাট লিস্ট মেক হিম টক।

তনিমা কানের কাছে ফিসফিস করল— এই বোকা, যা হোক কিছু করে দে না। নইলে এরা...

লজ্জায়, অপমানে মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে ঝিনুকের—

—যা ইচ্ছে করতে পারি তো? অন দিস গ্যারি কুপার?

—শিয়োর! তুই যদি...

কথা শেষ না-হতেই দুম করে সায়নের পেটে ঘুসি চালিয়েছে ঝিনুক। একহাতে হেঁচকা টান মেরেছে চুলে। তারপর গুমগুম কিল বুকে পিঠে।

—আরে, আরে করছিস কী? মেয়েটা কি পাগল নাকি?

ঝিনুক মরিয়া। ক্রমাগত দু-হাত একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। পিস্টনের মতো। সায়ন কোনোরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে একসময়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাসছে পেট চেপে— ওয়েল ডান বেবি। ওয়েল ডান।

এরপরেই তো সবার সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়া। গলায় গলায়। সিনিয়ররাই সেদিন ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল সবাইকে। দুটো করে মাংসের শিঙাড়া, চা— এখন থেকে উই আর অল ফ্রেন্ডস। নো তুমি আপনি বিজনেস। স্রেফ তুই! ডান?

—ডান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ডান বললেই কি আর ডান হয়ে যায়? যায় যে না, তার জীবন্ত প্রমাণ ওই সায়ন মিত্র। পার্ট টু দিয়ে বেরিয়ে গেছে তবু রেহাই নেই। ফার্স্ট ইয়ারটা পুরো বোর করেছে। সেকেন্ড ইয়ারে উঠেও...। দেখতে পেলেই এক কথা— আরেকবার আমার চুল ধরে মুঠিটা চেপে ধর প্লিজ। সেদিনের মতো ধোলাই দে। পারফেক্ট ম্যাসোকিস্ট। দেবে ধোলাই। শেষবারের মতো মোক্ষম ধোলাই দিতে হবে সায়নকে। এয়ারপোর্টের কথা যখন লিখেছে, যাক না-যাক আসবে নিশ্চয়ই। ঝিনুককে টেস্ট করতে। শেষ শিক্ষাটা তখনই পাওনা আছে ছেলেটার। আঙুলে চুল চেপে বিছানায় ঝাঁপ দিল ঝিনুক। ইমরান খান, জর্জ মাইকেলের দল তখনও প্যাট প্যাট তাকিয়ে।

তিন

সল্টলেক এয়ারপোর্ট মিনি এত আস্তে আস্তে যায় ধারণা ছিল না ঝিনুকের। সেই কখন বাসে উঠেছে পাঁচটার আগে, ছ-টা বাজতে চলল এখনও কাঁকুড়গাছি এল না। ফুলবাগানের কাছে উৎকট জ্যামে স্থির হয়ে আছে। ঝিনুক ঘড়ি দেখল। ছ-টা বাজতে দশ। ঠিক করেছিল একটু আগে আগেই লাউঞ্জে পৌঁছে যাবে। টিকিট কেটে বসে থাকবে চুপচাপ। তারপর...। ব্যস্ত মুখে ঝিনুক জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। কলকাতাটা দিনে দিনে যেন জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর আর ইটকাঠের জঙ্গল। তার মধ্যে হিংস্র জন্তুর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে বাস, মিনিবাস, লরি, ট্রাম। না, ট্রাম ঠিক জন্তু নয়। সরীসৃপ। আর গাড়ি-ট্যাক্সিগুলো হরিণশাবক, বুনো শুয়োর। নিজের বানানো উপমাগুলো নিজেরই ভালো লেগে গেল হঠাৎ। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছল। বেরোনোর আগে ময়শ্চারাইজার মেখেছিল, চোখের পাতায় মাসকারা দিয়েছিল সুন্দর করে। গলে গেছে, না, আছে কে জানে। কেন যে নির্বোধের মতো ওসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগাতে গেল! মা বার বার ভুরু বেঁকিয়ে দেখছিল তাকে —কাকে সি অফ করতে যাবি বললি? তোদের ক্লাসের ছেলে?

—না। বললাম তো আউটগোয়িং ব্যাচ।

—কী নাম?

—তুমি চিনবে না মা। সায়ন।

—চিনব কী করে? এর কথা তো আগে কোনোদিন বলিসনি।

জেরা করতে করতে মা-র চোখমুখ পুরো ঝানু ব্যারিস্টার। কেন যে মা ল পড়েনি! ঝিনুক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। মা-র ক্রসের মুখে কখন কী বেরিয়ে যায়। দুনিয়ার সব কথা এখন আর মা বাবাকে বলা যায় না। সকলেরই কিছু কিছু কথা নিজস্ব থাকে। একান্ত ব্যক্তিগত।

আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে মিনি। ঝিনুক সিটে সোজা হয়ে বসল। কাঁকুড়গাছি পেরোচ্ছে। ভি.আই.পি.-তে পড়ে স্পিড নিল। প্রথম হেমন্তের বিকেলটা গলতে গলতে মিশে যাচ্ছে কাঁচা অন্ধকারে। দূরে, সল্টলেকের দিকে হালকা কুয়াশার পর্দা। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস কেটে বাস ছুটে চলেছে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে গেল। ফাঁকা হতে হতে এখন ভেতরে মাত্র তিনজন যাত্রী। লাস্ট বাট ওয়ান স্টপে তারাও নেমে যেতে আচমকা ঝিনুকের গা ছমছম করে উঠল। ফাঁকা বাসে বসে থাকলে নিজেকেও কি ফাঁকা ফাঁকা লাগে? বুকটা ক্রমশ শূন্য হয়ে যাচ্ছে যেন। নার্ভাসনেস? দুর, ঘাবড়ানোর কী আছে! ঝিনুক বাস থেকে নেমে জোরে শ্বাস টানল। গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে। জিভ খরখরে। একবার বাসটার দিকে ফিরে তাকাল। ফিরে যাবে? হ্যাট, ফিরবে কেন? এত দূর এসে ফেরার কোনো মানে হয় না। সায়ন নিশ্চয় বাবা মা-র সামনে বাঁদরামি করবে না। আজকালকার ছেলেরা পেরেন্টসদের সামনে হেভি গুডি গুডি থাকে। আজ ওর মুখোশ খুলতে হবে। লাল কালো চেক শার্ট আর জিন্স প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে ধীর পায়ে এগোল ঝিনুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছে সায়ন। হল ঘরের মতো বিশাল লাউঞ্জে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ। তাদের টপকে সায়ন প্রায় এক লাফে ঝিনুকের কাছে— হাই। এসেছিস তবে?

—দেখতেই পাচ্ছিস।

—আয়। বলেই সায়ন তার হাত ধরেছে। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বাবা মা-র সামনে, এই দেখো, এই হল ঝিনুক। সরি মেরিলিন মনরো। আমার প্রিয় বন্ধু। আমাদের খুব ভাব।

কী ডাহা মিথ্যে রে বাবা। ঝিনুক হাঁ হয়ে গেল।

সায়নের বাবা তাকে বসতে বললেন— কোথায় থাক তুমি?

—অনেক দূর। সেই গোলপার্ক। ঝিনুকের আগে বলে উঠেছে সায়নই— আমি যাচ্ছি বলেই তো...

ঝিনুক চোখ পাকাতে গিয়েও সামলে নিল। না। সে অত অসভ্য নয়। সায়নের বাবা মা-র সামনে...।

সায়নের মা তার হাত ধরেছেন, সায়ন আচমকা অন্য হাতটা ধরে টান দিল— চল, কফি খেয়ে আসি।

ঝিনুক পাশে প্লাস্টিকের চেয়ারটাতে বসে পড়ল।

—কী রে, আয়।

—আমি কফি খাব না।

—লজ্জা? সায়ন ঠোঁট টিপেছে। এ ভঙ্গি ঝিনুকের চেনা। এখখুনি কিছু অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড করে বসবে। হয়তো বাবা-মার সামনেই। বেহায়া ছেলেরা সব পারে। ওর বাবা মা-ও মজা পাওয়া মুখে তাকিয়ে ছেলের দিকে। ঝিনুক অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল।

—চল।

কর্নারের কফি বারটার দিকে যেতে যেতে কথা বলছে সায়ন,

—ভাবতেই পারিনি মাইরি তুই সত্যি আসবি।

ঝিনুক চুপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ইচ্ছা করছে হাঁটু গেড়ে তোর সামনে বসে যাই।

মনস্থির করে ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল —আমি যাচ্ছি।

—কোথায়? সায়ন থমকেছে একটু।

—কোথায় আবার? বাড়ি। দেখবি লিখেছিলি, দেখা তো হয়ে গেছে।

—তোর কিছু বলার নেই?

—কী থাকবে?

—কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলি না তো?

—প্রয়োজন নেই।

সঙ্গেসঙ্গে সায়নের মুখটা কেমন বোকা বোকা হয়ে গেছে। ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল— তোকে খুব জ্বালিয়েছি।

—পুরোনো কথা।

—ডু ইউ রিয়েলি হেট মি?

ছেলেটা কেঁদেই ফেলবে নাকি! ঝিনুকের এতক্ষণে হাসি পেল। কী ভোম্বল ভোম্বল হয়ে গেছে মুখটা! হাসি চেপে একটু এগোল। সায়নের নীলচে চোখে চোখ রেখেছে —ডায়ালগ মারছিস কেন? দিল্লিতে আমার মতো অনেক হাঁদা মেয়ে পাবি। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে যত খুশি...

—তুই তাহলে জানিস? পলকে সায়নের চোখে এক-শোটা ফ্লুরেসেন্ট টিউব জ্বলে উঠেছে যেন।

—কী?

—এই আমি যে দিল্লি যাচ্ছি।

—না জানার কী আছে?

সায়ন বুঝি পারলে হাঁটু মুড়ে বসে যায় ঝিনুকের পায়ের কাছে। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার হাত ধরেছে —রিয়েলি তোকে একটা কথা বলার ছিল।

—কী কথা?

—থাক। তুই চটে যাবি। সায়ন ঢোক গিলল দু-বার। বলতে বলতে চোখ-মুখ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। মোটেই সায়ন-টাইপ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো মতন তোতলাতে শুরু করেছে, — প্র প্র প্রথম দিনের মতো আর এ এ একবার মারবি আমাকে? প্রচণ্ডভাবে? ফর দ্য লাস্ট টাইম?

একই সংলাপ। কিন্তু তার প্রেজেন্টেশনে চমকে দিয়েছে ঝিনুককে। সায়ন মিত্রও তবে তোতলায়! হাতে চাপটা আরও জোর হচ্ছে, —আয় ওয়ান্ট টু বি র‍্যাগড। বাই ইউ ওনলি! টিল ডেথ।

পি.এ. সিস্টেমে ফ্লাইট নাম্বার ঘোষণা করছে দিল্লির। ঝিনুকের এখখুনি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। কিংবা ধরা উচিত সায়নের চুলের মুঠি।

কিন্তু একী! বুকের মধ্যে বর্ষায় ভরা দামোদর ধাক্কা মারছে কেন? দু-চোখ ছাপিয়ে বন্যার জল। ঝিনুক জানে না এ জলের উৎস কোথায়।

এ কান্না উনিশ বছর বয়সেরই। হাসি, মজা বা রেগে যাওয়ার মতনই। ঝিনুক বোঝে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ি, রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী

দুপুরবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর একটু নিজের মনে সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে বসে শান্তা। কিংবা কোনো বই বা ম্যাগাজিন। ঘুমের অভ্যেস এককালে ছিল। আজকাল শরীর ঝামেলা করে। একটু ঘুমোলেই গা ম্যাজম্যাজ, মাথা ভার, বুক জ্বালা। বুবলার হাফহাতাটা শেষ করে লালটির কার্ডিগান ধরতে হবে। তারপর শুভর পুলওভার। নিজের জন্যেও একটা চোলিকাট ব্লাউজ বানানোর ইচ্ছে আছে। ইদানীং সবাই খুব পরছে। অবশ্য ততদিন শীত থাকলে হয়। একসময় ভালো হাত চলত, বিয়ের পর প্রথম শীতে শুভর লালকালো জাম্পারটা তো সাতদিনে শেষ করে ফেলেছিল। তখন সময়ও ছিল অফুরন্ত। সারাদিন এক মনে শুধু সময় নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এখন সময় নিজে ছুটছে তাড়াখাওয়া কুকুরের মতো। তাল দিতে গিয়ে শান্তা নাজেহাল। দম নেওয়ার আগেই ছোট পড়িমড়ি করে।

তাতেও যদি ধরা যায় সময়কে। ধরার আগেই পিছলে পিছলে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘর। চা, ভাত, ডাল, তরকারি। শুভ সকালে ভাত খেতে পারে না। তার জন্য রুটি। ছেলে-মেয়েদের টিফিন। ওয়াটারবটলের জন্য জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করা। শুভ লালটি আগে পরে বেরোয়। লালটির বাস আসে সাড়ে ন-টায়। ওরা বেরিয়ে গেলে বুবলাকে নিয়ে পড়তে হয়। দস্যি ছেলেকে স্নান খাওয়া করাতেই একগাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়। বেশিরভাগ দিনই স্কুলে না-যাওয়ার বায়নাক্কা। এর মধ্যেই কাপড় বদলে চুল-টুল ঠিক করে শান্তা। কপালে টিপ লাগায়। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে ফিরতে ফিরতে বারোটা। এ সময় আরেকবার ঠিকে-ঝিটা আসে, তার সঙ্গে খানিক বকবক শেষে স্নান-খাওয়ার পর এই একটু বিশ্রাম।

হলুদ গোলাটায় বিশ্রী জট পাকিয়ে গেছে। শান্তা একমনে গিঁটগুলো খোলার চেষ্টা করে। মনটা সকাল থেকেই খচখচ করছে। শুভ আজ একটাও কথা বলেনি তার সঙ্গে। বেরোনোর সময়ও না। এমনিতে অবশ্য সকালের দিকে খুব একটা কথা হয় না দু-জনের। সময় কোথায়? তবে আজ শুভ ইচ্ছে করেই কথা বলেনি। বাবুর রাগ হয়েছে। ঠিক আছে, কতক্ষণ রাগ থাকে দেখা যাক। শান্তা গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবে না। আজকের দিনেও সে যদি মেজাজ দেখাতে পারে, শান্তার কীসের ঠেকা ভাব করতে যাওয়ার? তা বলে গাল ফুলিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। বিকেলে কত কাজ। বুবলাকে স্কুল থেকে আনার সময় রসগোল্লা কিনতে হবে। প্রতিবছরেই এ দিনটায় রসমালাই বানায়। ঘরে তৈরি রসমালাই শুভর খুব প্রিয়। এ ছাড়া সাবির মাকে দিয়ে মশলা করিয়ে রেখেছে। সন্ধেবেলা গরমগরম কচুরি ভাজবে, সঙ্গে আলুর দম। কেউ-না-কেউ আজ বাড়িতে আসবেই। দিদি-জামাইবাবু তো প্রতিবছর আসে। আগেরবার নন্দিনীরা এসেছিল। অনিমেষদারও ঠিক মনে থাকে আজকের তারিখটা। সন্ধেবেলা যথারীতি বউদিকে নিয়ে হাজির হবে। সঙ্গে একগোছা ফুল আর মিটিমিটি হাসি।

হলুদ গিঁট আলগা করে সুতো টানল শান্তা। অতগুলো লোক যে বাড়িতে আসবে তার জন্য কোনো মাথাব্যথা আছে শুভর? বিন্দুমাত্র না। শুধু নিজের রাগ নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে একবার জিজ্ঞেস করল না পর্যন্ত। দুনিয়ার লৌকিকতা, সামাজিকতা করার দায় যেন একা শান্তার। উনি দিব্যি মেজাজে টইটম্বুর হয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। জানে তো, বাড়িতে অতিথি এসে পড়লে শান্তা একটা-না-একটা ব্যবস্থা করবেই।

গোলা সামলাতে গিয়ে কাঁটা থেকে ঘর পড়ে গেছে। গলার ছাঁটটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে উঠে পড়া যাক। শান্তা কাঁটার মুখে কাঁটা ধরল। রাতের রান্নাও এবেলা সেরে রাখা দরকার। একটু পর থেকেই তো ধুমধাড়াক্কা, হুটোপুটি। বুবলাকে নিয়ে আসার পর লালটি ফিরবে। ওদের জলখাবার দেওয়া, জামাকাপড় বদলানো। বাইরের লোকজন আসবে, ঘরদোরও সাজাতে হবে একটু। কাশ্মীর থেকে আনা বেডকভারটা পাতলে হয়। পর্দাগুলোও পালটালে ভালো হত। যাকগে, বুবলাকে আনার সময় বরং বেশি করে ফুল কিনে আনবে। গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা। ফুলদানিতে চারটি ফুল রাখলে ঘরের চেহারাই বদলে যায়। অন্যবার শুভই সকালে বাজার থেকে ফুল নিয়ে আসে। আজ যা হাবভাব, বিকেলে তাড়াতাড়ি ফিরবে কি না তাও সন্দেহ। ছেলেদের বেশ মজা। ইচ্ছে করলে রাগ-টাগ দেখিয়ে দিব্যি সংসার থেকে সরে থাকতে পারে। শান্তার কোথাও যাওয়ার নেই। এই সংসার চারদিক থেকে তাকে অক্টোপাসের মতো খামচে রয়েছে। আজ যদি সে রাগ করে চলে যায় কোথাও! রাত করে ফেরে! ভাবা যায়! ইস লোকে কী বলবে? লালটি বুবলা তো কেঁদেই সারা হবে। আর শুভ বুঝি বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাবে। আসলে এ-বাড়ির খাট, আলমারি, দেওয়াল, দরজার মতো সেও একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। এ-বাড়ির সদর দরজাটার মতো সেও কোথাও নড়তে পারে না। রাগ, দুঃখ, অভিমান সব তাকে চার দেওয়ালে পুষে রাখতে হয়।

দুর, কী সব এতাল-বেতাল ভাবনা! শান্তা সেলাই রেখে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। বোকার মতো চোখে জল আসছে। কোনো মানে হয় না। এত মনখারাপ করার কী আছে? সামান্য কিছু কথা-ছোড়াছুড়ি, ও তো সবসময় হয়। আপনাআপনি আবার মিটেও যায়। আসলে আজকের দিনেও শুভর মুখভার করে থাকাটা শান্তাকে কষ্ট দিচ্ছে বেশি। এ-কষ্ট শুধুই তার একার। শুভ যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তেমন করে আর কিছুতেই ছুঁতে পারে না শান্তার মনটা। বুঝতেই পারে না শান্তা কী চায়। তবে কি আর তাকে আগের মতো ভালোবাসে না শুভ? ধুৎ, তাই-বা কী করে হয়? এই তো গত মাসে, তার যখন ধুম জ্বর, শুভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিস কামাই করে দু-দুটো দিন বসে রইল বাড়িতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো, বার বার ছোটো ডাক্তারের কাছে। জ্বর ছাড়ার পরও তাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি ক-দিন। নিজেই সংসার সামলেছে, অপটু হাতে কাজকর্ম সেরেছে। শান্তা আলগোছে পাশ ফিরে শুল। তবু কেন তার মনে হয়, শুভ অনেক বদলে গেছে? নাকি সে আর নিজেই বুঝতে পারে না শুভকে? একজনের মনকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে আরেকজন কি পারে? প্রথম প্রথম চেষ্টা হয়তো থাকে। তারপর শুরু হয় মানিয়ে গুনিয়ে চলা। একসঙ্গে শোয়া বসার অভ্যেস।

কাল রাতে বারকয়েক প্রশ্নটা ছুড়েছিল শুভ। শান্তা তখন শোয়ার আগে আঁটসাঁট করে চুল বাঁধছে। শুভ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়। লালটি বুবলা ঘুমিয়ে কাদা।

—এই, কাল কী নেবে বলো।

শান্তা কোনো উত্তর দেয়নি। প্রতিবছর একই প্রশ্নের জবাব দিতে কারুর ভালো লাগে? তা ছাড়া বিবাহবার্ষিকীর মানে কি শুধুই উপহার আদানপ্রদান? সত্যি সত্যি সম্পর্ক কি তাই? অবশ্য শুভ এক্কেবারে কিছু না-দিলেও ভালো লাগবে না শান্তার। একটু মন খচখচ করবেই। সব মেয়েরই বোধ হয় করে। মানুষ প্রিয়জনের কাছ থেকে কিছু পেতেই তো ভালোবাসে সব থেকে বেশি।

প্রথম বছর নিজে থেকেই একটা মুক্তোর সেট এনেছিল শুভ। জিনিসটা দেখতে মন্দ না, তবে সবুজ পাথরগুলো না-থাকলে আরও সুন্দর হত। কথাটা জানাতেই শুভর কী আপশোস— ইস, চলো কালই গিয়ে পালটে আনি!

—থাক না। এটাই-বা খারাপ কী?

—তোমার পছন্দ হয়নি।

—কে বলেছে? শান্তা ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিল, তুমি ভালোবেসে যা দেবে, তাই সুন্দর।

—বলছ?

—হুঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবার বেশ কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছিল তারা। ছোট্ট ফ্ল্যাটখানা ফুলে ফুলে একাকার। সবাই চলে যেতে একটা একটা করে ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিল শুভ। ফুলশয্যার রাতের মতো গোড়ে মালা দুটো বালিশে জড়ানো।

—এবার থেকে প্রতিবছর এভাবে বিছানা সাজাব। যতদিন বাঁচব।

শুনে শান্তা হেসে বাঁচে না, সে কী? বুড়ো হয়ে গেলেও?

—আমরা কখখনো বুড়ো হব না। কোনোদিন আমাদের বয়স বাড়বে না।

—বা রে, সময় শুনবে কেন?

—সময়ের সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। সময় যত বাড়ে, ভালোবাসা গভীর হয়।

শান্তা আবার পাশ ফিরল। দ্বিতীয় বছর তাকে কী দিয়েছিল শুভ? ওহো, সেবার তো সে নার্সিং হোমে। লালটি হল। তার পরের বছর ফুলে ফুলে বাড়ি ভরে গেলেও বিছানায় কাঁথা, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বটল। এখন তো শুভর জন্য আলাদা সিঙ্গল বেডের ব্যবস্থা। ছেলে-মেয়ে নিয়ে শান্তা শোয় বড়ো খাটে। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে এক আধদিন তারা যখন এক বিছানায়, তখন কত সাবধানতা তাড়াহুড়ো। ভাল্লাগে না। সব কিছুই কেমন মেশিনের মতো হয়ে গেছে। শান্তা একাই নয়, শুভও একটা নিয়মে বাঁধা যন্ত্র। কবে থেকে যে জীবনটা এমন হয়ে গেল!

কাল শান্তার উত্তর না-পেয়ে শুভ আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, শাড়ি নেবে?

শান্তা চুপ। কী বলবে? এখন বউকে কিছু দেওয়ার ধরনটাও শুভর যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

—বলো কী চাও? আমেরিকান ডায়মন্ডের সেট আনব? না, ভালো পারফিউম?

বারকয়েক প্রশ্ন করার পর বিরক্ত হয়েছিল শুভ, তোমার কী হয়েছে বল তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী আবার হবে? কিছু না।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন?

—এমনি।

এরপর শুভ উঠে সিগারেট ধরায়। সামান্য খোশামোদের চেষ্টা করে, আরে বাবা, লজ্জা কী, বলেই ফেলো না কী চাই?

—কিছু চাই না, শুয়ে পড়ো।

শুভ আস্তে আস্তে ধৈর্য হারাচ্ছিল।

—তোমাদের, মেয়েদের এই এক ন্যাকামো, সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে জান না।

—ব্যাঁকা কী বললাম?

—ব্যাঁকা নয়? সাধারণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি...

—দেখো, তোমার সঙ্গে বকবক করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। সারাটা দিন খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠে যায়, কোনো সময় তো ফিরেও তাকাও না। বছরে একদিন অদিখ্যেতা করে আর...

—বুঝেছি। শুভ সঙ্গেসঙ্গে গম্ভীর। —আর কিছু বলতে হবে না।

—সত্যি কথা বললেই গায়ে ছ্যাঁকা লাগে...

এভাবেই কিছুক্ষণ অকারণ কথা-কাটাকাটির পর বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল শুভ। শান্তাও তাকে ডাকেনি।

নাহ, আর শুয়ে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। শান্তা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল আয়নার সামনে। কাল অত কথা না-শোনালেই হত। কী যে মাঝে মাঝে হয়ে যায়! মেজাজটা কিছুতেই বাগে রাখা যায় না। এ-রকম চলতে থাকলে...। নাহ, শুভ বাড়ি ফিরলে সে আজ নিজে থেকেই মিটমাট করে নেবে। সন্ধে বেলা একটু সাজগোজ করলে কেমন হয়? শুভ বেশ চমকে যাবে তাহলে। শান্তা নরম করে হাসবে তখন, এখনও রাগ আছে?

শুভ ঠোঁট ফুলিয়ে তাকাবে বাচ্চা ছেলেদের মতো। শান্তা ওর বুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত রাখবে, তুমি তো আজকাল নিজে থেকে আমাকে কিছু দাও না। বেশ, আমি আজ নিজেই চাইছি...

শুভ শান্তাকে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেবে। তখনও হয়তো দ্বিধা। শান্তা নিজেই ওর হাত তুলে ছোঁয়াবে নিজের বুকে, শুনবে না কী চাই?

নিশ্চয়ই আর রাগ করে থাকতে পারবে না শুভ। ওকে কাছে টানবে। আর সেই ফাঁকে শান্তা টুপ করে বলে ফেলবে মনের কথাটা, শাড়ি, গয়না, আসবাব এসবের মধ্যে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি গো। আমাকে তুমি আগের মতো একটা রঙিন দিন উপহার দিতে পার?

এভাবে শেষ করতে পারলে একটা দারুণ রোমান্টিক বিবাহবার্ষিকী গল্প লেখা যেত। তার আগেই আমার গল্প থেকে দুম করে উঠে এল শান্তা। খোলা চুল চুড়ো করে মাথার ওপর যেমন তেমন জড়ো করা, ঘাড়ে তিরতির ঘাম। আটপৌরে শাড়িতে মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাচ্ছে, থামুন। বন্ধ করুন আপনার লেখা।

—কেন? কী হল?

—বাহ, আপনার হাতে কাগজ কলম রয়েছে বলে আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেবেন? এ চলতে পারে না।

—তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

—প্রথমটা মন্দ শুরু করেননি। ঝগড়াঝাঁটি, কথাবন্ধ, এমনকী মন খারাপ হওয়া অবধি ঠিকঠাক ছিল। তারপরে একগাদা রোমান্স-ফোমান্স এনে যাচ্ছেতাই রকমের ক্যাতকেতে করে ফেললেন।

—বা রে, আমি তোমার মনের কথাই তো লিখতে চাইছিলাম। তোমার ভেতরকার আবেগগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে...

—আবেগ এলেই ও-রকম সব ডায়ালগ বলতে হবে নাকি? মুখে আঁচল চেপে খিলখিল হেসে উঠল শান্তা, তাও বিয়ের বারো বছর পরে? ইমপসিবল! আপনার দেখছি কোনো আইডিয়াই নেই!

—কিন্তু একদিন তো এসব ডায়ালগই ভালো লাগত।

—যখন লাগত লাগত। সব কিছুর একটা সময় আছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তোমরাই কিন্তু বলেছিলে ভালোবাসার সময় নেই।

—একটা বয়সে সবাই বলে। বাস্তবিক কি তাই হয়? শান্তা হাসি থামাল, উঁহু, আপনার দেখছি ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে কনসেপশনই নেই! ওসব মধুর মধুর দৃশ্য ফিল্মে ভালো লাগে কিংবা আপনাদের মতো লিখিয়েদের গল্প উপন্যাসে। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ও-রকম কখখনো হয় না। বাস্তব হল সমুদ্রের মতো। যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছে। ভেতরে যান, দেখবেন জল ক্রমশ কেমন শান্ত, গভীর...

—তাহলে বলছ মধ্যবয়সে তোমরা আর ওধরনের সংলাপ বল না?

—বলার দরকার হয় না।

—বিবাহবার্ষিকীর দিনেও নয়? নিশ্চয়ই মানো আজ তোমাদের সম্পর্কটা রিনিউআলের দিন?

—মন্দ বলেননি। শান্তা আমার টেবিলে উঠে বসল, তবে সম্পর্ক রিনিউআল না-বলে অভ্যেস রিনিউআল বলতে পারেন। আমাদের সম্পর্ক আবেগ, আদর, ভালোবাসা সবই খাওয়া-ঘুমোনোর মতো একধরনের অভ্যেস হয়ে গেছে। কিংবা অভ্যেসটাই ভালোবাসা।

—তাই যদি তবে রসমালাই বানাতে গেলে কেন?

—বানালাম। বানাতে হয় তাই। শান্তা ঠোঁট ওলটাল, তা ছাড়া সন্ধে বেলা লোকজন আসবে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্য...

—আর শুভর সঙ্গে কাল যে ঝগড়াটা করলে? সকাল থেকে সে কথা বলেনি, মনখারাপ, এ-ও কি হতে হয় তাই?

শান্তা বুঝি থমকাল। সেই সুযোগে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম, তুমি বোধ হয় ঠিক বলছ না শান্তা। সবটা শুধু অভ্যাস হতে পারে না। আমি তো জানি বিয়ের আগে তিনটে বছর, বিয়ের পরও বছর দেড়েক তোমরা কী করেছ। গঙ্গার ধারে সাঁইত্রিশ দিন, ভিক্টোরিয়ায় ছাব্বিশটা সন্ধে, কাফে-ডি-মনিকোর বাহান্নটা বিকেল, তারপর বিয়ের পর রাতের পর রাত... মনে পড়ে তখনকার কথা? বলতে চাও তার কিছুই অবশিষ্ট নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে শান্তার গালে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ, আপনি কি তখন থেকেই আমাদের ফলো করেন নাকি?

—করি বই কী। কাফে-ডি-মনিকোতে তোমরা যখন পরস্পরের আঙুল ছুঁয়ে বসে থাকতে, মনে হত একটা অদৃশ্য তরঙ্গ তোমাদের শরীরে খেলা করছে। গঙ্গার ধারে বসে যখন দু-জনে তাকিয়ে থাকতে দূরে জাহাজগুলোর দিকে, কী সুন্দর একটা ভালোবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে। বারো বছর একসঙ্গে থাকার অভ্যেসে তার সবটাই...

শান্তা এবার উদাস যেন। শেষ ঢিলটা ছুড়লাম, আজ যদি শুভ ফিরে হঠাৎ তোমাকে আগের মতো করে আদর করে, তোমার কি একটুও ভালো লাগবে না? সত্যি বল তো?

শান্তা ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে, ভাবতে খারাপ লাগে না। তবে সত্যি বলতে কী ও-রকম হয় না।

—কী হয় তাহলে?

—আমাদের পেছনে সবসময়ই তো ঘুরঘুর করছেন। আজও থাকুন রাত অবধি। কী হয় দেখে নেবেন।

অতিথিরা কেউ তখনও আসেনি। শান্তা কাজ-টাজ সেরে ছেলে-মেয়েদের একটু পড়িয়ে নিচ্ছে, ডোরবেল বাজাল। শুভ ফিরল হাতে কিছু ফুল আর একটা বাদামি প্যাকেট। দরজা খোলার সময় শান্তা আড়চোখে দেখে নিল সেটা। বিকেল বেলা আজ একটু সাজ করেছে। চুল পেঁচিয়ে বাহারি খোঁপা বেঁধেছে মাথায়, মুখে হালকা প্রসাধন, আকাশি নীল তাঁতের শাড়িতে বেশ ঝকমকে দেখাচ্ছে তাকে। চোরা চোখে একবার বউকে দেখে নিয়ে ভেতরে এল শুভ, কেউ আসেনি?

—নাহ্।

—এটা রাখো। পছন্দ হয় কি না দেখো।

লালটি দৌড়ে এল, বাপি, তুমি দেরি করলে? মা বলছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে পার...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারোগার সামনে পড়া আসামির মতো শান্তার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল শুভ।

—তাড়াতাড়ি তো বেরিয়েছিলাম। বাসট্রামের যা অবস্থা, তার ওপর আজ তিনটে মিছিল বেরিয়েছে এসপ্লানেডে...

শান্তা নিঃশব্দে রান্নাঘরে চায়ের জল বসাতে গেল।

রাতে ছেলে-মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, শান্তা যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে, শুভ পাশে এল, অনিমেষদারা এবার এল না কেন বলো তো?

—কী জানি! শান্তা কাঁটা খুলে চুলের গোছা ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর, নন্দিনী এবারও এসেছে। ওদের অ্যানিভার্সারিতে কিন্তু যেতেই হবে।

—কবে যেন ওদেরটা?

—দেরি আছে। ডিসেম্বরে। শান্তা পাশের টেবিলে পড়ে থাকা পিয়োর সিল্কে হাত বোলাল।

শুভ ঝুঁকল, পছন্দ হয়েছে?

—এত দামি কিনতে গেলে কেন? তোমাকে পয়সা কামড়ায়?

—দাম নিয়ে ভাবতে হবে না। কেমন হয়েছে বলো।

—আরেকটু ডিপ পেলে না? রংটা বড়ো ম্যাড়ম্যাড়ে...

শুভ গোমড়া হল, এইজন্যেই তোমার জিনিস আমি কিনতে চাই না। কাল অত করে জানতে চাইলাম... অযথা মেজাজ দেখালে।

—মেজাজ তুমি দেখাওনি? শান্তা সঙ্গেসঙ্গে ঘুরে বসেছে, সকাল বেলা বাজারটা পর্যন্ত করে দিলে না। এত লোকের আয়োজন, আমি একা একা...

—কথা বললে তখন উত্তর দিতে তুমি? রাত থেকে যা একটা মুখ করে রেখেছিলে! মাঝে মাঝে তোমার মাথায় ভূত চাপে!

—আমার মতো খেটে মরতে হলে দেখতাম কার মেজাজ ঠিক থাকে।

—নিজেই যেচে খাটো। কতদিন থেকে বলছি একটা রাতদিনের লোক রেখে নাও...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্তা ফোঁচ ফোঁচ নাক টানল। শুভ সিগারেট নেভাল।

—শোভনা বউদি বলছিল হাতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। আমি কালই গিয়ে নিয়ে আসব।

—না, না। শান্তা চোখ-মুখ ঘোরাল। —রাতদিনের লোক মানেই গাদাগুচ্ছের খরচা। কোনো দরকার নেই।

—মনে থাকে যেন। আর এ নিয়ে খোঁটা দিতে পারবে না।

—হ্যাঁ, আমি তো শুধু খোঁটাই দিই। শান্তার ঠোঁট ফুলল, তুমি কিছু বল না!

এ-প্রসঙ্গ আর বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শুভ কথা বদলাতে চাইল, তোমাকে আজ সন্ধে বেলা বেশ দেখাচ্ছিল।

—খোশামোদ। শান্তা চুলে চিরুনি চালাল, রসমালাই কেমন হয়েছিল?

—মন্দ নয়। তবে আজকাল বড়ো বেশি ভ্যানিলা মেশাও তুমি। আগে আরও ভালো করতে।

—খেয়ে তো নিলে চেটেপুটে! শান্তা ঠোঁট টিপল।

—খেলাম। শুভ ঝুঁকে আচমকা একটা চুমু খেয়ে ফেলল বউকে।

লালটি ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছুড়ছে। ওর লাথি খেয়ে বুবলা যেকোনো মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে। শান্তা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল।

—কী, দেখলেন তো?

—দেখলাম।

—বুঝলেন কিছু?

—মনে হচ্ছে বুঝেছি।

—কচু বুঝেছেন। শান্তা শুভর বিছানা থেকে চাপাস্বরে হেসে উঠল, যান, এবার কেটে পড়ুন। আজ অন্তত আমাদের কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন।

ঘরের ভিতর অন্ধকার যেন অন্ধকার নয়, মাঝসমুদ্রের গাঢ় নীল শান্ত জল। এবার মনে হয় গল্পটা ঠিক ঠিক লিখে ফেলতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ বছর পরে

বিস্ময়ের চকিত ধাক্কায় প্রথমটা কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল সরসীর। আশ্চর্য! এ-রকমও হয়! অবিকল সেই চেহারা! লম্বা! বলিষ্ঠ! নির্মেদ! সেই ঝকঝকে উজ্জ্বল মুখ, চওড়া কপাল! তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ আর্য নাক! সমুদ্রগভীর চোখ! মাথার চুলগুলো পর্যন্ত একইভাবে আঁচড়ানো! সামনের দিকে অল্প ফাঁপিয়ে ব্যাকব্রাশ করা! কী করে এত মিল হয়!

সরসীর চোখ স্থির। শেষ সন্ধ্যায় শৌখিন চীনা রেস্তরাঁয় তখন বেশ ভিড়। আশেপাশের টেবিলগুলো মানুষে মানুষে জমজমাট। এয়ারকন্ডিশনারের পাহাড়ি শীতলতার সঙ্গে এক মায়াময় আলোছায়া মিলেমিশে স্বপ্ন স্বপ্ন পরিবেশ চতুর্দিকে। সেই স্বপ্নআলোতে রাকেশ বুঝি কোনো মায়াবলে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে সামনে। টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে পুরোনো সেই চেনা ভঙ্গিতে বসে আছে। সেই রাকেশ। পঁচিশ বছর আগের সেই দুরন্ত তরুণ রাকেশ মালহোত্রা।

আপনাআপনি সরসীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, —অ্যাবসার্ড। এত নীচু স্বরে বলল যে, ঠিক তার পাশে বসা দিব্যেন্দুর কানেও পৌঁছোল না শব্দটা। রুমির কানে তো নয়ই। দিব্যেন্দু এই মৃদু আলোতেও মন দিয়ে একটা সায়েন্স জার্নাল পড়ার চেষ্টা করে চলেছে। টেবিলের অন্যপ্রান্তে বসা রুমির চোখ মেনুকার্ডের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপা উত্তেজনায় সরসী এবার মেয়ের দিকে ঝুঁকল, এই দেখ, দেখ একবার, ওদিকে তাকা।

রুমির থতমত চোখ ঘুরল এদিক-ওদিক, কী গো?

—ওই যে ওদিকে দেখ, বাঁ-দিকের সামনের টেবিলের ছেলেটাকে।

দেখল রুমি। আড়চোখে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিল, দেখলাম। কী হয়েছে?

—ওকে আমি চিনি।

—ধ্যাৎ।

—হ্যাঁ রে, ভীষণ চেনা।

—মা প্লিজ, ওভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না।

দিব্যেন্দুও এতক্ষণে চোখ তুলেছে, কে রে? কাকে দেখছিস?

সরসী দিব্যেন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল, ওই ছেলেটাকে দেখো একবার।

—কোথায়?

—ওই তো।

—বাহ, ছেলেটার ফিজিকটা দারুণ তো। পাঞ্জাবি মনে হয়। মোনা পাঞ্জাবি।

সঙ্গেসঙ্গে রুমির গলায় কিশোরী অস্বস্তির চাপা ধমক—উফ, তোমাদের নিয়ে পারা যায় না। বলছি দেখো না ওভাবে। বলছে বটে তবে তার ষোলো বছরের ইন্দ্রিয় না-তাকিয়েও ঠিক দেখে নিচ্ছে অদূরে বসা তিন সদস্যের পরিবারটিকে।

—ছেলেটার মা কিন্তু তোমাদের লক্ষ করছে।

ছেলেটার পাশে বসা সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা সরসীরই সমবয়সি প্রায়। চল্লিশ ঘেঁষা ভারীসারি শরীর। গোলগাল ধরনের। হালকা নীল আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যায় প্রচুর প্রসাধন করেছে মহিলা। গাল দুটো টসটস করছে পাকা ডালিমের মতো। ফোলা ফোলা ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। কাজলটানা চোখ। চুল টেনে চুড়ো করে বাঁধা। তবে ও-মুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে ছেলেটার মুখের কোনো মিল নেই। ওটা যদি মা হয়, তবে এদিকে পিঠ করে বসা প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা কি বাবা? ইয়া এক ঢলঢলে পাঞ্জাবি পরা! মাথার পিছনে ছোট্ট মুটে টাক। বাপ রে, কী মোটা কী মোটা। বিশাল একটা পাহাড় যেন। পাহাড়টার একটু নড়াচড়াতেই হারিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। টুকি দিয়ে লুকিয়ে পড়ার মতো।

পলকে সরসীর মস্তিষ্কেও টুকি। পাহাড়টা রাকেশ নয় তো! হতেও তো পারে। পঁচিশ বছর সময় অনেক কিছুই উলটেপালটে দিয়ে যায়। জীবন। শরীর। মন। দিয়েছেও তো। সে নিজেও কি কম বদলেছে? উনিশ বছরের সরসীর কতটুকু আর চিহ্ন আছে এই তেতাল্লিশ ছোঁয়া শরীরে? অথবা মনে? দীর্ঘ সময় ধরে রূপ থেকে রূপান্তরে যেতে যেতে সরসী রায় কবেই পুরোনো পরিচয় মুছে ফেলে এখন মনেপ্রাণে মিসেস সরকার। দিব্যেন্দু সরকারের স্ত্রী। রুমির মা।

বহুকাল পর সরসীর বুকটা আচমকা ঢিপঢিপ করে উঠল। রাকেশ কি এখন এখানে থাকে? এই চণ্ডীগড়ে? নাকি বেড়াতে এসেছে তাদেরই মতো?

কৌতূহল ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। সরসী আর থাকতে না-পেরে বলেই ফেলল, দাঁড়া, সামনে গিয়ে একবার দেখে আসি ভালো করে।

শুনেই রুমি কটমট করে তাকিয়েছে, একদম যাবে না। তুমি সত্যি কী যে হয়েছ না মা!

—কী হয়েছে? চেনা লাগছে, একটু দেখে আসি না।

—না। দেখতে হবে না।

বয়সের নিজস্ব নিয়মেই যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে রুমি। বিব্রতও। রুমির বয়সের মেয়েরা ভাবতেই পারে না তাদের মায়েরাও ওই বয়সটা ছুঁয়েছিল একদিন। ওই বয়সেই তো যত ব্রীড়া, সংকোচ, পর্দা টানা। সরসীর হাসি পেয়ে গেল।

দিব্যেন্দুও হাসছে মিটিমিটি, ভেরিফিকেশন করবে কি করবে না পরে ডিসাইড কোরো। আগে কী খাবে বলে দাও তো দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটারটা এমনভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ছেলেটা সম্পূর্ণ আড়াল এখন। রুমি নতুন করে মেনুকার্ড সামনে টেনে নিল, আমি আগে একটা ক্লিয়ার সুপ খাব। পরে মিক্সড চাউমিন আর সুইট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন, ব্যস।

—আর তুমি?

—আমাদের জন্য ফ্রায়েড রাইস-টাইস যা হোক কিছু বলে দাও না। সঙ্গে... বলতে গিয়ে দুম করে কথা বন্ধ হয়ে গেছে সরসীর। শরীর টান টান হয়ে গেল। পাহাড়ের মতো মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে। পাশ ফিরল। এপাশ দিয়ে বেসিনের দিকে যাচ্ছে। মুখটা সামনাসামনি পড়তেই... রাকেশ। রাকেশই তো। ওই বিপুল দেহ, মেদভরা গাল গলা চিবুক, সব কিছুকে ছাপিয়েও ও-মুখ ঠিক চিনে ফেলা যায়। এত বছর পরেও।

রাকেশও দেখেছে সরসীকে। অবাক দৃষ্টি থমকে রইল কয়েক সেকেন্ড। চমকের পর্দা সরে যেতে যেটুকু সময় লাগে, সেটুকুই। চিনতে পেরেই বিস্ময়ে ফেটে পড়েছে, সর্সি!

চতুর্দিকের চাপা গুঞ্জন বুঝি নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেক চোখ একসঙ্গে চমকে উঠে দেখছে দৈত্যের মতো মানুষটাকে। রাকেশের ভ্রূক্ষেপ নেই। আবারও সেই ভরাট স্বর গুমগুম করে উঠল, আরে সর্সি! তুম! তুমি এখানে!

সর্সি। সর্সি। সর্সি।

...সর্সি নয়। সরসী বলো, সরসী।

—সর্সি।

—হল না। আবার বলো।

—আমার সর্সিই ঠিক আছে।

—সরসী মানে জানো?

—কী?

—পুকুর। দিঘি। তালাও। বুঝেছ বুদ্ধুরাম?

—তুমি রাকেশ মানে জানো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—জানি স্যার। চাঁদ। তোমার ছায়া আমার জলে পড়ে।

—জিন্দেগি ভর?

—উঁহু। কখনো কখনো। জল নড়লেই ছায়া ভেঙে যাবে।

—কভি নেহি।...

সরসী কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। এসব সময়ে যে মুখে হাসি ফোটাতে হয় তাও যেন ভুলে গেছে।

রাকেশ টেবিলের সামনে চলে এসেছে, কী ম্যাডাম? মনে হচ্ছে ঠিকঠাক চিনতে পারছ না?

সরসী খুব দ্রুত সম্বিতে ফিরল। একবার চকিতে দেখে নিল দিব্যেন্দু আর রুমিকে। আড়ষ্ট হাসি ফুটল মুখে, চিনব কী করে? যা একখানা চেহারা করেছ। তোমার ছেলেকে না-দেখলে জীবনেও চিনতে পারতাম না।

—তুম ভি বহুৎ চেঞ্জ হয়ে গেছ। আমার পুরা দশ সেকেন্ড টাইম লেগে গেল তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে। সভ্যতা ভব্যতার নিয়ম ভেঙে হো হো করে হেসে উঠল রাকেশ। যেন এটা একটা মানুষভর্তি রেস্তরাঁ নয়, যেন আশপাশে কেউ কোথাও নেই। হাসতে হাসতেই তাকিয়েছে দিব্যেন্দু আর রুমির দিকে, আপনারা খুব অবাক হয়েছেন তো? আমি রাকেশ। রাকেশ মালহোত্রা। সেই কলকাতার কলেজে পড়ার সময় সর্সি আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল। আই মিন গার্লফ্রেন্ড। যদিও সর্সি দু-ক্লাস জুনিয়র ছিল আমার থেকে, স্টিল ওয়ান্স আপন আ টাইম উই ওয়্যার...।

দিব্যেন্দু হাসছে ঠোঁট টিপে। রুমিও। দু-জনেই বেশ মজা পেয়েছে।

রাকেশ হাত বাড়িয়ে দিল দিব্যেন্দুর দিকে।

দিব্যেন্দু বলল, আরে আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

—বসবই তো। জরুর বসব। কিতনা দিন বাদে সর্সির সাথ দেখা হল। হিন্দি, ইংরেজি আর ভুলভাল বাংলা মিশিয়ে অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলছে রাকেশ। কথা থামিয়ে নরম চোখে রুমির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে রইল কয়েক পলক, হোয়াট আ লাভলি গার্ল। জাস্ট লাইক এ বাডিং ফ্লাওয়ার। সর্সি, তোমার মেয়ে কিন্তু তোমার থেকেও সুন্দর হয়েছে। এই মেয়ে, তুমি আমার ছেলের সাথ ফ্রেন্ডশিপ করে নাও। বলেই চেঁচিয়ে ডাকছে বউ ছেলেকে, প্রীতি, রাহুল, তুমলোগ ভি ইধর আ যাও। জলদি। দেখো কৌন হ্যায় ইয়েলোগ। আই হ্যাভ গট আ ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ টু নাইট।

আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষে সকলে এক টেবিলে বসেছে। কথা বলছে। হাসছে। তবে প্রধান বক্তা রাকেশই। সরসী লক্ষ করল রাকেশের কথায়, ব্যবহারে, হাসিতে কোথাও বিন্দুমাত্র জড়তার আভাস নেই। আগের চেয়েও অনেক বেশি উচ্ছল, প্রাণবন্ত। হাসছে, চেঁচাচ্ছে, দুমদাম বেফাঁস কথা বলে অপ্রস্তুতের একশেষ করছে সরসীকে। নিজের বউ-এর পেছনে লাগতেও ছাড়ছে না। রুমি রাহুলকে তাদের কলেজ জীবনের মজার মজার গল্প শোনাচ্ছে। দিব্যেন্দুর সঙ্গেও নিছক কথা বলছে মাঝে মাঝেই। মনে হয় সরসীকে দেখে তার খুশি হওয়াটা নেহাতই হঠাৎ কোনো পুরোনো বন্ধুকে দেখে ভীষণ ভালোলাগার মতো। তার বেশি কিছু নয়। যেন পুরোনো সব অভিমান, অপমান, যন্ত্রণাকে সে কবেই বাসি ফুলের মতো ভাসিয়ে দিয়েছে সময়ের স্রোতে। যেন সরসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্মৃতিগুলো এখন তার কাছে শুধুই বহু যুগ আগে দেখা রোমান্টিক ফিল্মের দৃশ্য মাত্র।

সহজভাবে হাসতে গিয়েও বুকের গভীরে কোথায় যেন একটা চিনচিনে কষ্ট অনুভব করছিল সরসী। সময় কি এভাবে অতীতকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে পারে? কিছু পড়ে থাকে না? কোনো নালিশ? কোনো দীর্ঘশ্বাস? রাকেশ নিখুঁত ভান করছে না তো? ভুলে থাকার নিপুণ অভিনয়? হাসি ঠাট্টার মোড়কে অতীতের তিক্ত দিনগুলোকে মনে না-আনার চেষ্টা? নিশ্চয়ই তাই। তা না-হলে সরসীরা পরশুই চণ্ডীগড় থেকে চলে যাবে শুনে অমন করে আটকানোর চেষ্টা কেন?

—না প্রফেসরসাব, আপনাদের তো ইতনা জলদি চণ্ডীগড় থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া হবে না। আমাদের ইউনিক সিটি চণ্ডীগড়কে, আমাদেরকে, আগে দেখে নিন ভালো করে। তারপর কুলু মানালি যাবেন। পরয়ানু চলুন একদিন। রোপওয়ে চলে এক পাহাড় সে এক পাহাড়।

এতক্ষণে রুমি বেশ সহজ হয়ে গেছে। সে বলে উঠল, ওরে বাবা, পরয়ানুতে ক-দিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল না?

—সো হোয়াট? রিস্ক না-থাকলে লাইফের আর কী আছে? এই চণ্ডীগড়ের আশেপাশেই তো টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি লেগে আছে, তাতে কী হল? এখানে কি মানুষ থাকবে না? না বেড়াবে না? তোমাদের কলকাত্তাতে নকশাল মুভমেন্ট হয়নি? এই তো ক-দিন আগে বোমা ফাটল সেন্ট্রাল ক্যালকাটায়।

রুমি বলল— সেটা অবশ্য ঠিক কথা।

—তবে? এখানে কত কিছু দেখার আছে, দেখে নাও। চাও তো রাহুলকে সাথ ঘুমো। ওর মোটর সাইকেল আছে। রক গার্ডেন দেখো, জাকির গোলাপ বাগ দেখো, সুকনা লেখ দেখো। নেকচাঁদের হাতে তৈরি রক গার্ডেন দেখলে তাজ্জব বনে যাবে।

সরসী বলল, আমরা আজই রক গার্ডেন দেখে এসেছি। ওয়ান্ডারফুল।

—আবার যাব আমরা। সব এক সাথ।

দিব্যেন্দু বোঝাতে চেষ্টা করল —আসলে ব্যাপারটা কী জানেন রাকেশজি, আমার কলেজের আর বেশিদিন ছুটি নেই। রুমিরও স্কুল খুলে যাবে। কুলু মানালিটা ঘুরে না-এলে...

—ঠিক হ্যায়। অ্যাট লিস্ট সাত দিন তো এখানে থাকুন। ছুটি নয় একটু এক্সটেন্ড করা যাবে। কালই আপনারা হোটেল ছেড়ে আমার গরিবখানায় চলে আসবেন। দিস ইজ ফাইনাল। সেক্টর বাইশে একটা ছোটো বাড়ি বানিয়েছি আমরা।

প্রীতিও খুব আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাল— আপলোগোঁ কো আনাই হোগা। কাল হি চলে আইয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যেন্দু সরসী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল— ঠিক আছে, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

—তো চলুন। আমার গাড়িতে আপনাদের হোটেলে ছেড়ে দিয়ে আসি।

হোটেলে ফিরে হাসিতে ভেঙে পড়ল রুমি— উরেব্বাবা, কী-একটা সাংঘাতিক বয়ফ্রেন্ড ছিল তোমার মা! আগে তো কখনো এর কথা বলনি?

সরসী দিব্যি বলে ফেলল— আমার কি ছাই মনে ছিল যে বলব।

দিব্যেন্দু বলল— ওর পাশে তোর মাকে কীরকম লাগছিল দেখেছিলি? পর্বতের পাশে মূষিক। গাড়িতে ওঠার সময় তোর মা-র পাশে যখন দাঁড়িয়েছিল...

সরসী লজ্জা পেল— যাহ, ও আগে মোটেই এত মোটা ছিল না। ছেলেটাকে দেখে বুঝতে পারলে না?

রুমি বলল— ছেলেটা কিন্তু সত্যিই হ্যান্ডসাম। তবে একটু ইনট্রোভার্ট টাইপের। শাই। কথাবার্তা বলছিল না কোনো।

দিব্যেন্দু প্যান্টশার্ট বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। আরাম করে খাটে শুয়ে সিগারেট ধরাল— তুই এত লক্ষ করেছিস?

—বা রে লক্ষ না করার কী আছে? ছেলেটার মা-ও তো খুব কম কথা বলে।

—কথা বলার স্কোপ ছিল কোথায়? তোর মা-র বন্ধুই তো একা ব্যাটিং করে গেল।

সরসী রুমিকে বলল— কেন, তোর সঙ্গে তো ছেলেটা পরে কথা বলছিল দেখলাম।

—সে তো ফর্মাল কথা। ব্রিটিশদের ওয়েদার রিপোর্ট নিয়ে কথা বলার মতো।

দিব্যেন্দু সিগারেট নিভিয়ে সায়েন্স জার্নালটা খুলল আবার— ওসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ছেড়ে এখন কাজের কথাটা ভাবো তো আগে। ভদ্রলোক যা নাছোড়বান্দা, কাল ঠিক সকালে এসে হাজির হবেন।

আশঙ্কাটা সরসীরও যে নেই তা নয়। সে বলল— তোমরাই ঠিক করো কী করবে।

—আমি কারো বাড়ি-ফাড়ি গিয়ে থাকতে পারব না বলে দিলাম। তা ছাড়া কুলু মানালি যাওয়ার জন্য অলরেডি গাড়ি বুক করে ফেলেছি। ক্যানসেল করলে কিছু গচ্ছা যাবে।

—সেটা তখনই বলে দিতে পারতে।

—আমি কী করে বলব? তোমার বন্ধু, তুমিই তো বলবে।

—দেখলে তো কেমন ঝুলোঝুলি করছিল। এমনকী রাকেশের বউও। তখন কি মুখের ওপর না বলা যায়?

রুমি ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে দিল— একটা কাজ করা যায়। আরও দু-চারদিন আমরা এখানে থেকে যেতে পারি।

দিব্যেন্দু চোখ ঘোরাল— কুলু মানালিতে থাকা কিন্তু তাহলে কমে যাবে।

—ঠিক আছে। সিমলাটা এবার ক্যানসেল করে দাও। তবে মা, আমরা কিন্তু এখানেই থাকব। এই হোটেলে। ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকাটা তোমাকেই ক্যানসেল করতে হবে।

দিব্যেন্দু বলল— সে তো বটেই। ওসব বাড়ি-ফাড়ি গিয়ে থাকা তো যাবেই না। ও ব্যাপারটা তুমি যে করেই হোক কাটাবে।

সরসী বাথরুমে যাওয়ার জন্য কাঁধে টাওয়েল ঝুলিয়ে নিল। মাথাটা জ্বালা করছে। অক্টোবরের শুরুতেও এখানে এখন বেশ গরম। ভালো করে স্নান করা দরকার। বাথরুমে ঢোকার আগে দিব্যেন্দুর উদ্দেশে বলল, বাড়ি গিয়ে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে কী বলা যায় তুমিই একটু ভেবে বল না। আমার মাথায় বাবা কিছু আসছে না।

সত্যিই কিছু মাথায় আসছিল না সরসীর। রাকেশের বাড়িতে গিয়ে ওঠা তারও পোষাবে না। অনেকদিন পর দেখা হয়েছে, চমক লাগল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো লাগল ব্যস। অযথা মাখামাখি করার দরকার কী? ভাবতে গিয়ে সরসী হোঁচট খেল সামান্য। মানুষের মন কী বিচিত্র! যে রাকেশকে একদিন না-দেখলে ছটফট করত সরসী, তাকেই আজ, এতদিন পর দেখেও এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। পরিবেশ অভ্যাস সময় মনের গঠনটাকেই কেমন অন্যরকম করে দেয়। তখন অতীতকে সাময়িক আবেগ দিয়ে একটুক্ষণ শুধু ছুঁয়ে দেখতেই ভালো লাগে মাত্র। এও এক ধরনের দুঃখবিলাস। এ বিলাসিতার একটা নির্দিষ্ট সীমাও থাকে। তার বাইরে যেতে হলেই আবেগ অসহ্য হয়ে পড়ে। রাত্রে তাই শোয়ার আগে দিব্যেন্দু যখন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, তোমার সঙ্গে রাকেশের প্রেম-টেম ছিল নাকি গো?

সরসী অবলীলায় উত্তর দেয়— দুর, প্রেম আবার কী। বন্ধুত্ব ছিল। কিম্বা বলতে পার এক ধরনের মোহ। ইনফ্যাচুয়েশন। ওই বয়সে যেমন থাকে আর কি। ওই বয়সেই আসে, ওই বয়সেই মিলিয়ে যায়। সাবানের ফেনার মতো।

বলে ঠিকই, তবু অন্ধকার ঘরে কেন যে তার ঘুম আসে না আজ! বিছানায় উঠে বসে দূরের ছায়া ছায়া পাহাড়গুলোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার মাখা সার সার কালো পাহাড়গুলোর মাথায় আকাশে লালচে ভাব। বোধ হয় মেঘ জমেছে। ওই পাহাড়ের ওপার থেকেই ঝমঝম করে এগিয়ে আসে বৃষ্টি। কাল দুপুরেই যেমন হঠাৎ এসেছিল। অনেক দূর থেকে ক্রমে ক্রমে যখন কাছে এল তখন শুধুই টিপটিপ টিপটিপ, বর্ষণ তেমন হল না। ক্ষীণ অস্তিত্বটুকুই টের পাওয়া গেল মাত্র।

সরসীর শরীর বেয়ে শিহরন খেলে গেল। আজ আচমকা রাহুলকে দেখা, দেখে চমকে ওঠা, অকারণ আবেগ, আবেগের মধ্যে দিয়েই রাকেশ, এক পলকের জন্য হলেও রাকেশের চোখে ভুলে যাওয়া অতীত, কিম্বা মাঝে মাঝে রাকেশকেই খুঁজতে বার বার রাহুলকে ফিরে ফিরে দেখা, এসব কি শুধু ওই পাহাড় থেকে নেমে আসা কালকের বৃষ্টিটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো? নিছকই অস্তিত্ব ঘোষণা? কোনো এক সময়ের? সরসী বুঝতে পারছিল না। সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল শুধু।

সকাল হওয়ার আগেই সত্যি সত্যি হাজির রাকেশ। সকাল হওয়া মানে সরসীর সকাল। দিব্যেন্দু বা রুমি বেলা ন-টার আগে ছুটির দিনে ঘুম থেকে ওঠে না কখনো। বেড়াতে এসে আরওই তো উঠবে না। সরসীর অবশ্য একবার ঘুম ভেঙেছিল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম চোখে দরজা খুলতেই সামনে রাকেশ। দুর, রাকেশ কোথায়! এ তো রাহুল। রাহুলের পেছনে খানিক তফাতে রাকেশ। সরসীর অতীত। সরসীর বর্তমান।

—গুড মর্নিং। প্রফেসারসাব কোথায়? রুমেলা?

সরসী হাসল— রুমেলা নয়, রুমি। আমার মেয়ের ভালো নাম যাজ্ঞসেনী।

—ইয়াগ্নোসেনী? মানে দ্রাউপদি?

—ইয়াগ্নো নয়, যাজ্ঞ।

—আমি ইয়াগ্নোই বলতে পারব।

—ঠিক আছে, তাই সই। এসো, ভেতরে এসো। সরসী সুইটের এক প্রান্তে রাখা সোফাসেটে বসতে বলল ওদের। ভাগ্যিস মাঝখানে পর্দা টানা আছে! রুমিটা যা বিশ্রীভাবে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোয়।

—তোমরা সবাই রেডি তো? সামান কোথায়?

সরসী ঢোক গিলল— রাকেশ ডোন্ট মাইন্ড... আসলে কী জানো... আমার বর মানে দিব্যেন্দু কারো বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে না। আনইজি ফিল করে। রুমিও। আমরা এই হোটেলেই থাকি? প্লিজ?

এক সেকেন্ডের জন্য রাকেশের মুখটা কালো হয়ে গেল কি? সরসী বুঝতে পারার আগেই রাকেশ অবশ্য হেসে উঠেছে শব্দ করে, আই নো। আমি জানতাম। তুমি এখনও সে-রকমই জিদ্দি আছ। আমার বাড়িতে তুমি যাবে না। রিফিউজই করবে।

—ছি ছি, এটা কী বলছ? সরসী ঝপ করে গিয়ে রাকেশের হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেপে ধরেছে রাহুলের সামনেই— একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ। তোমার বাড়িতে আমরা নিশ্চয়ই যাব। আজকেই যাব।

রাকেশ মুখ ঘুরিয়ে নিল— এখান থেকে কবে স্টার্ট করছ? কালকেই?

—না। কাল না। আমরা এখানে তিনদিন থাকছি। তোমাদেরই সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধে। রাতটুকু শুধু হোটেলে এসে...

নীরব চোখে রাকেশ একবার শুধু তাকাল তার হাতের ওপর পড়ে থাকা শ্যামলা রং হাতটার দিকে। আলগা একটা নিশ্বাসও ফেলল যেন— ঠিক হ্যায়। অ্যাজ ইউ উইশ। আমি তো তোমার ওপর জোর করিনি কখনো।

রাহুল রীতিমতো কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। সরসী সচকিত হল। ছেলেটা এক বর্ণও বাংলা বোঝে না এই যা রক্ষে। কিন্তু পর্দার ওপারে যারা আছে? বাবা? মেয়ে?

গলাটা যথাসম্ভব নীচু রাখার চেষ্টা করল সরসী— আমি তোমাকে ইচ্ছে করে কোনোদিন দুঃখ দিতে চাইনি রাকেশ। কখনো কখনো পরিস্থিতির কাছে মানুষ এমন অসহায় হয়ে যায়।

বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল। রাকেশের পাশ থেকে উঠে পর্দার ওপারে চলে গেল সরসী। দিব্যেন্দু নেই। বোধ হয় উঠে বাথরুমে গেছে। কিছু শুনেছে কি? শুনলে শুনুক। এখন আর শোনা না-শোনায় কী আসে যায়!

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সরসী গিয়ে ধাক্কা দিল মেয়েকে— এই রুমি, ওঠ, উঠে পড়।

রুমি লাফ দিয়ে উঠে বসেছে— ওরা এসে গেছে?

—কখন।

—ছেলেটা এসেছে?

—তোর মতো বেলা অবদি সবাই ঘুমোয় নাকি?

নাইটির ওপর হাউসকোট জড়িয়ে রুমি ছুটে এসেছে এপারে। ভারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্দা সরিয়ে দিল টান মেরে— সরি আঙ্কল সরি রাহুল, সকালবেলা তোমাদের চণ্ডীগড়ের ওয়েদারটা এত সুন্দর, একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নির্মল হাসি দিয়ে রাকেশ রুমিকে কাছে টেনে নিল— আমাদের চণ্ডীগড়ের সবটাই সুন্দর।

শহরটা সত্যিই সুন্দর। যত দেখছিল, মুগ্ধ হচ্ছিল সরসী আর দিব্যেন্দু। তিন-চার দিন ধরে গোটা শহরটাকেই প্রায় দেখা হয়ে গেল। কী চমৎকার সাজানো গোছানো, পরিচ্ছন্ন। চওড়া চওড়া রাস্তা। কোথাও কোথাও রাস্তার দু-ধারে মনোরম ক্যাসিয়া গাছের সারি। বসন্তকালে গাছগুলো নাকি ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে যায়। যেতে যেতে রাকেশ পরিচয় করিয়ে দেয় শহরটার সঙ্গে।

—ওই দেখো শান্তি কুঞ্জ।

—ওই আমাদের গোলাপ বাগ। বোগেনভিলা গার্ডেন।

—এটা আমাদের সেক্রেটারিয়েট।

—এই সেক্টরে আমার একটা ছোট্ট ফ্যাক্টরি আছে। রবার গুডসের।

—ওটা দেখো পাঞ্জাবের অ্যাসেম্বলি হাউস। ওটা হরিয়ানার।

রাস্তার পর রাস্তা, সেক্টরের পর সেক্টর পেরিয়ে ছুটে চলেছে রাকেশের চকোলেট মারুতি। সামনের সিটে রাকেশ দিব্যেন্দু। পিছনে সরসী একাই। প্রীতি আজ বাড়িতেই রয়ে গেছে, সরসীদের জন্য খাবার বানাচ্ছে নিজের হাতে। লাস্ট ডিনার। সরসীর মনটা খুঁতখুঁত করছিল। রাকেশ-প্রীতি তিন দিন ধরে এত করল তাদের জন্য, পরিবর্তে তেমন কিছুই ওদের দেওয়া হল না। পরশু বিকেলে সুপার মার্কেট থেকে রাহুলের জন্য একটা ভালো টিশার্ট কিনেছে শুধু। রাকেশ প্রীতির জন্যও দু-একটা উপহার কেনা উচিত ছিল, হয়ে উঠল না। দিব্যেন্দু অবশ্য এর মধ্যেই জোর করে দু-দু-বার রেস্তরাঁর বিল মিটিয়েছে। রাকেশ আপ্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা দেওয়া সত্ত্বেও। এখানকার হোটেল রেস্তরাঁর যা চার্জ! তবুও রাকেশ যা করেছে সে তুলনায় ও খরচাটা কিছুই নয়।

সরসীর ভাবনাটা দিব্যেন্দু যেন পড়ে ফেলেছে, রাকেশকে বলে উঠল— ক-টা দিন খুব এনজয় করলাম এখানে। শহরটাকেও। আপনাদেরও। আপনারা যা করলেন আমাদের জন্য! সব কাজ ফেলে রেখে!

দিব্যেন্দুর কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে পাহাড় বুঝি লজ্জা পেল একটু, বাঁ-দিকে টার্ন নেওয়ার জন্য স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বলল, কাম অন প্রফেসারসাব, আমার এতদিনকার পুরোনো গার্লফ্রেন্ড আমার শহরে এসেছে, এ তো আমার মিনিমাম ফর্জ।

দিব্যেন্দু হাসল, আমাদের থেকেও বেশি এনজয় করল রুমি। সারাদিন রাহুলের সঙ্গে যা টোটো করে বেড়াচ্ছে, শহরের একটা ঘাসও বুঝি চেনা বাকি রইল না।

রাকেশ হা হা করে হেসে উঠল— ওদেরই তো এনজয় করার বয়স। কি সর্সি, ঠিক না?

হাসিটা যেন কাচের টুকরোর মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ টুকরোগুলো ছিটকে এসে বিঁধে গেল সরসীর বুকে। সরসী চোখ বুজে ফেলল। বন্ধ চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে উদ্দাম গতিতে একটা মোটর সাইকেল ছুটে চলেছে। বুক কাঁপানো শব্দ তুলে। হেলমেট মাথায় কে চালাচ্ছে ওই গাড়িটা? রাহুল? না রাকেশ? কে ওই বসে তাকে জড়িয়ে ধরে! রুমি? না সরসী? বাতাসে তার চুল উড়ছে! বুক জুড়ে ডুবডুব সুখ!

রাহুল আর রুমির অবিরাম মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়ানোটা প্রথমদিনেই বড়ো চোখে লেগেছিল সরসীর। দু-একবার ঠাট্টা করে মেয়েকে বলেও ফেলেছে— দেখিস প্রেম-টেমে পড়ে যাস না যেন। চণ্ডীগড়ে শ্বশুরবাড়ি হলে কিন্তু খুব মুশকিল হবে।

রুমি খিলখিল করে হেসে উঠেছে— সত্যি মা, তোমার ইম্যাজিনেশনের জোর আছে। প্রেমে পড়া এতই সহজ নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী জানি বাবা, তুই যেরকম এক পায়ে খাড়া হয়ে গেলি! রাহুল একবার বলতে-না-বলতেই...

—বা রে, ওইটুকু মারুতি কারে ছ-জন মিলে গাদাগাদি করার কোনো মানে হয় নাকি? তা ছাড়া গাড়ির থেকে মোটর সাইকেলে অনেক বেশি থ্রিল। রাহুলটাও যা চালায় না! স্টার্ট দিলেই আশি। তারপর হু হু করে এক-শো। ওয়াও! দু-দিকের গাছগুলো ঝড়ের আগে পেছনদিকে ছুটে যাচ্ছে। হাওয়া ঝাপটা মারছে মুখে। দারুণ।

—দেখিস বাবা, ছিটকে পড়ে-টড়ে যাস না যেন।

—ইস, আমি অত আনাড়ি নাকি?

তবু সরসীর কেন যে বুক ধুকধুক করে বার বার! যতবার রাহুল আর রুমি চোখের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, ততবারই? সরসী অনেকবার মনকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে, এ আশঙ্কা কেন? কাকে ভয় তার? সন্দেহ? মোটর সাইকেলের দুর্বার গতিকে? কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াকে? নাকি ভয়টা অন্য কোথাও? আরও গভীরে?

আশঙ্কাটা লুকাতে না-পেরে দিব্যেন্দুকে বলেছে— তুমি বলছ না কেন তোমার মেয়েকে? যখন-তখন ছেলেটার সঙ্গে হুটহাট বেরিয়ে যাচ্ছে, শাঁ শাঁ করে মোটর সাইকেলে ঘুরছে.... কিছু যদি হয়ে যায়?

দিব্যেন্দু পাত্তা দেয়নি— তুমি ওদের নিয়ে অত পড়েছ কেন বল তো? ওরা একটু ঘুরুক না ইচ্ছেমতো। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে কি ওদের ভালো লাগতে পারে? ওই বয়সে তোমার লাগত?

সরসী বোঝাতে পারেনি ওইজন্যই তো বেশি ভয় তার। ওই বয়সটাকে সে যে বড়ো মোক্ষমভাবে চিনেছিল।

সরসী জানলার বাইরে তাকাল। এইমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে শহরে। আলোর সাজে সেজে উঠল রাস্তাঘাট। শহরটা সুন্দর বটে তবে বড়ো বেশি নির্জন। ফাঁকা ফাঁকা। রাহুল রুমি আজ কতদূরে গেছে? কখন ফিরবে? ভাবতে ভাবতে সরসী আচমকাই সামনের সিটটার দিকে ঝুঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে, প্রায় রাকেশের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল— এবার ফিরে চলো রাকেশ। বাড়ি চলো।

সেক্টর বাইশের রাকেশের দোতলা বড়িটা খুবই মনোরম, খোলামেলা। গেট দিয়ে ঢুকতেই সামনে ফুলের বাগান, ঘন সবুজ লন। একতলায় ড্রয়িং হল, রান্নাঘর, ডাইনিংরুম, স্টোর। দোতলায় শোবার ঘরগুলোর সামনে গাড়িবারান্দার মাথায় সুন্দর ছাদ একখানা। ছাদের আলসে ঘিরে বাহারি ফুলের টব।

তিরতির করে হালকা বাতাস বইছিল ছাদ জুড়ে। বাদামি মখমলের মতো একটা নরম অন্ধকার ছড়িয়ে চারদিকে। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে আলোর রশ্মি গড়িয়ে এসেও থমকে গেছে অদূরে।

ছাদের ঠিক মাঝখানে গার্ডেন চেয়ারে বসেছিল ওরা। দিব্যেন্দু আর রাকেশ। বাড়ি ফিরে দিব্যেন্দুর জন্য একটা স্কচের বোতল খুলেছে রাকেশ। দু-জনেই পান করছে অল্প অল্প করে। প্রীতি এসে এক প্লেট আলুভাজা রেখে গেল। প্রীতিকে সাহায্য করার জন্য সরসী এতক্ষণ নীচে রান্নাঘরে ছিল। একটু আগেই এসে বসেছে ছাদে। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে সেই আবছাপ্রায় পাহাড়গুলোর দিকে। অনেক দূরে কোনো একটা পাহাড়ের গায়ে এক বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে। এইমাত্র দৃষ্টির গোচরে ছিল, এই আবার নিভে গেল, আবার দপদপ করছে।

রাকেশ প্রথমদিনের মতোই এখনও সে-রকমই জড়তাহীন। এখনও মাঝে মাঝে হেসে উঠছে সে-রকমভাবে। সরসীর কেমন যেন রাগ হচ্ছিল মনে মনে। রাগের উৎসটা যে ঠিক কোথায় নিজেও বুঝতে পারছে না।

রাকেশ একবার জিজ্ঞাসা করল— কী সর্সি, তুমি এত চুপ কেন?

সরসী উত্তর দিল না। এই মুহূর্তে কোনো শব্দই আর ভালো লাগছে না। টের পাচ্ছে রাগটা ছাপিয়ে একটা চাপা উৎকণ্ঠা মনের দখল নিচ্ছে ক্রমশ। একসময় আর চুপ করে না-থাকতে পেরে বেশ জোরেই বলে ফেলল— কীগো, ঘড়ির দিকে তোমাদের কি কারো খেয়াল নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিব্যেন্দু চমকে তাকিয়েছে— কেন? কী হয়েছে?

—ক-টা বাজে?

—সাড়ে আটটা।

—রুমি রাহুল এখনও ফিরছে না কেন?

দিব্যেন্দু হেসে বলল— তুমি তাই নিয়ে ভাবছ বসে বসে? আজ লাস্ট রাত, দু-জনে একটু মনের আনন্দে বেড়িয়ে নিচ্ছে...।

—লাস্ট রাত বলে কি যা ইচ্ছে করতে হবে নাকি? সরসীর গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ,

—আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

রাকেশ এতক্ষণে বোধ হয় অনুমান করেছে কিছু। গ্লাস হাতে সরসীর সামনে উঠে এল। অন্ধকারেও বোঝা যায় তার মুখে হাসির রেখা— হুয়া কেয়া ইয়ার? ইতনা ইমপেশেন্ট কিঁউ?

আবার সেই হাসি। সরসীর পিত্তি জ্বলে গেল। দিব্যেন্দুর উপস্থিতি ভুলে কটমট করে তাকাল রাকেশের দিকে— আমার একটুও পেশেন্স নেই। তুমি তো জানোই।

—এটা রাগের কথা হল।

—রাগ নয়। আমার চিন্তা হচ্ছে।

—কী চিন্তা?

—কত কিছু হয়ে যেতে পারে জানো?

—কিছু হবে না। রাকেশ এবার হাসছে জোরে জোরে— রাহুল আমার খুব হুঁশিয়ার লড়কা আছে। দেখো হয়তো কোনো কফি পার্লারে বসে আড্ডা মারছে দু-জনে। যা দোস্তি বনে গেছে তোমার মেয়ের সঙ্গে।

সরসীর আরও রাগ হয়ে গেল। রাগের মাথায় বলে ফেলল— ওদের দেখে তোমার মজা লাগতে পারে, আমার একটুও লাগছে না। আমার মেয়েটা নয় বোকা তোমার ছেলের একটা সেন্স নেই? এত রাত পর্যন্ত...।

দিব্যেন্দু বেশ জোরেই ধমকে উঠল— আহ সরসী।

রাকেশ থমকাল। আলো আঁধারে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবু সরসী টের পেল এতক্ষণ পরে পাহাড়ে মেঘের ছায়া পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোটা সন্ধের ছন্দটাই যেন কেটে গেল আচমকা। রাকেশ চেয়ারে ফিরে অনেকখানি স্কচ ঢেলে ফেলল গলায়। দিব্যেন্দু গম্ভীর মুখে সিগারেট খেয়ে চলেছে।

প্রীতি আবার একটা পকোড়ার প্লেট নিয়ে এল। সবাইকে চুপচাপ দেখে বেশ অবাক হয়েছে— ইতনা সাইলেন্স কিঁউ ভাই?

রাকেশ নিজের দিলখোলা স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে অস্বাভাবিক রূঢ় গলায় বলে উঠল— তুমহারা লাডলাকো আনেদো আজ...।

—কিঁউ? কেয়া হুয়া?

—ইয়েলোগ ইতনা পরেশান হ্যায় আউর রাহুল আভি তক... ইতনা তো সমঝনা চাহিয়ে, দে আর ফ্রম আউটসাইড।

প্রীতির মুখ ম্লান হয়ে গেল। স্বামীর স্বর শুনে বুঝতে পেরেছে কোথাও একটা সুর কেটে গেছে। বিশ্রীভাবে। ধীর পায়ে ছাদের আলসেতে গিয়ে দাঁড়াল।

মোটর সাইকেলের গুমগুম শব্দটা বেজে উঠল তখনই। ফিরছে ওরা।

সরসী দু-আঙুলে কপাল টিপে ধরল। রাকেশ সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রীতি দিব্যেন্দুর দিকে তাকাল একবার। দিব্যেন্দুও প্রীতির দিকে।

রাহুল আর রুমি হইহই করে ওপরে উঠে আসছে। রাহুলের কোনো কথায় রুমি হাসছে খুব। হঠাৎই বাবা মায়েদের দিকে নজর পড়তে থমকে গেছে দু-জনেই।

রাকেশ কথা বলল প্রথম। ছেলের দিকে কঠোর চোখে তাকিয়েছে— ইতনা দের তক কাঁহা থে তুমলোগ? ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি সেন্স?

রুমি বলল, সরি আঙ্কল, দেরি আমার জন্যই হয়েছে। রাহুলের কোনো দোষ নেই। আমিই ওকে জোর করে...

দিব্যেন্দু পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব নরম গলায় বলার চেষ্টা করল, এত কেন দেরি করলি বল তো? আমরা সবাই কত ভাবছি...

—বা রে, কী করব? সন্ধে না হলে মোগল গার্ডেনে আলো জ্বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যে। আলোতে না-দেখলে ফোয়ারাগুলো দেখার কোনো মানেই হয় না।

—তা বলে এত দেরি করবি?

—বা রে, সুন্দর জায়গায় গেলে একটু বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে হয় না?

রাহুল রুমি দু-জনেরই মুখ একবারে স্বচ্ছন্দ। স্বাভাবিক। কোথাও কোনো গ্লানি নেই। অথবা অপরাধবোধ। সরসী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দিব্যেন্দু সুটকেসে চাবি লাগাতে লাগাতে বলল, ভদ্রলোক বোধ হয় আর আসবেন না। ওঁর সঙ্গে যা বিশ্রী ব্যবহার করলে তুমি কাল।

সরসী কিছু বলল না। কাল রাত থেকে মনটা তার অস্বাভাবিক ভারী হয়ে আছে। খুব খারাপ লাগছে। খুব। কেন কাল ও-রকম একটা বিশ্রী আচরণ করে ফেলল সে? রাগটা তার কার ওপর ছিল? রাকেশের ওপর? রাহুল রুমির ওপর? নাকি নিজেরই ওপর? পঁচিশ বছর আগে যে-মেয়েটা রাকেশের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, তার ওপরই কি চোখ রাঙায়নি সে? এ ক-টা দিন ধরে? অজস্রবার? রাহুলই কি পঁচিশ বছর আগের রাকেশ নয়?

রুমি অনেকক্ষণ আগে তৈরি হয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার হালকা নীল জিন্‌স, কালো টিশার্ট, হাতে সানগ্লাস। রাস্তার দিকে তাকিয়েই গম্ভীর মুখে বলল, আঙ্কল যখন অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, গাড়ি আসবেই। আমি শিয়োর। বলতে বলতে সরসীকে ঘুরে দেখে নিল, তবে বাবা, আঙ্কল যদি না-আসে আমরা কিন্তু যাওয়ার পথে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাবই। নইলে খুব অভদ্রতা হয়ে যাবে।

—তা তো বটেই। দিব্যেন্দুও তাকাল সরসীর দিকে, তোর মা কেন যে কাল অমন একটা কাণ্ড করে বসল! মাঝে মাঝে তোর মা-র মাথায় ভূত চাপে। সরসী তবুও চুপ। ভূতটা কেন মাথায় চেপেছিল আবার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন করে? পঁচিশ বছর পর? রাকেশ সত্যি হয়তো আর আসবে না। পঁচিশ বছর আগে যেভাবে একদিন অপমান মাথায় নিয়ে চলে গিয়েছিল একেবারে...।

নাহ। ওই তো রাকেশ এসেছে। বন্ধ দরজায় শব্দ বাজল টকটক টকটক।

সরসীর আগে রুমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলেছে— ও আঙ্কল, তোমার জন্য আমরা কখন থেকে ওয়েট করছি।

রাকেশ রুমিকে জড়িয়ে ধরল। হাসছে কী সুন্দর করে। কালকের রাতটাকেও কী অবলীলায় ভাসিয়ে দিয়েছে। আবারও। বাসি ফুলের মতো। সময়ের স্রোতে।

—প্রফেসারসাব, আপনাদের গাড়ি কিন্তু নীচে এসে গেছে।

রুমি জিজ্ঞাসা করল— রাহুল এল না আঙ্কল?

—আসবে না কেন বেটি? তুমি চলে যাবে আর তোমাকে রাহুল সি অফ করতে আসবে না, এ হতে পারে?

—কোথায় ও?

—নীচের দোকানে তোমার জন্য কী কিনছে।

—রিয়েলি? রুমির চোখ আনন্দে ঝিকমিক। রাকেশকে ছেড়ে তক্ষুনি ছুটেছে নীচে। পাগলের মতো দৌড়চ্ছে।

মিনিট দশেক পর, গাড়িতে সব মালপত্র উঠে গেছে যখন, সরসী নিঃশব্দে পাহাড়টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কত ক্ষুদ্র, কী নীচু মনে হচ্ছে নিজেকে এই মুহূর্তে। আপনাআপনি মাথা হেঁট হয়ে গেল— সরি রাকেশ। সরি ফর এভরিথিং।

রাকেশ হেসেই চলেছে মৃদু মৃদু, কুলু থেকে এখানে ফিরছ তো?

সরসী বেশ জোরেই বলে উঠল, ফিরব বই কী। নিশ্চয়ই ফিরব।

এতক্ষণে রাকেশের হাসি মুছেছে। একদৃষ্টে দেখছে সরসীকে। যেভাবে পাহাড় তাকিয়ে থাকে মেঘের দিকে।

মেঘ বুঝল এবারও তার ছলনা ধরা পড়ে গেছে। মেঘ কি আর চাইলেই ফিরতে পারে! পাহাড়ের কাছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল গোলাপ

কতকাল পরে যে বিশ্বজিৎকে দেখল তৃণা। পাঁচ বছর! নাকি আরেকটু বেশি?

বোধ হয় ছ-বছর। সুকান্ত-তৃণার বিয়েতে বিশ্বজিৎ আসতে পারেনি। পরে কী একটা কাজে যেন এসেছিল কলকাতায়, তখন একবার ঘুরে গিয়েছিল এখান থেকে। বড় জোর ঘণ্টাখানেক ছিল। তারপর আর এমুখো হল কই! সেই যে চাকরি নিয়ে পাড়ি জমাল চণ্ডীগড়ে, কলকাতাকে ভুলেই গেল। সুকান্ত তৃণাকেও।, নাহ, ভুল হল। এখনও নিয়ম করে একটা বন্ধুকৃত্য করে বটে বিশ্বজিৎ। প্রতি বছর তৃণা সুকান্তর বিবাহবার্ষিকীতে একটা করে চিঠি পাঠায়। তিন, কি চার বাক্যের। চিঠির মোদ্দা কথা একটাই। সুখে থাকো।

ছ-বছরে বিশ্বজিতের চেহারায় কি খুব বদল ঘটেছে? হুঁ, তা তো একটু ঘটেছেই। তৃণা লক্ষ করছিল বিশ্বজিতের রগের দু-একটা চুলে এখন রুপোলি রং, লম্বা শরীরের টিঙটিঙে ভাবটা উধাও, বেশ খানিকটা মাংস বা চর্বি লেগেছে ছ-ফুট কাঠামোয়। মুখে একটা সতেজ কাঠিন্য ছিল বিশ্বজিতের, সেটাও কেমন কোমল হয়ে এসেছে যেন। চকচকে গালে গাঢ় নীলচে ভাব। এক সময়ের ঝাঁকড়া দাড়ি বিশ্বজিৎ কি এখন ইলেকট্রিক শেভারে দাড়ি কামায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বজিৎও চোখ কুঁচকে দেখছে তৃণাকে— কী রে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবি নাকি? ভেতরে ঢুকতে দিবি না?

তৃণা দ্রুত সামলে নিল নিজেকে— তোকে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত। তুই আসবি না!

—যা যাহ। এটা তোর বাড়ি নাকি? সুকান্তর বাড়ি।

তৃণাকে প্রায় ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিল বিশ্বজিৎ। তৃণার যে কী হয়ে গেল, বাচ্চা মেয়েদের মতো খপ করে চেপে ধরেছে বিশ্বজিতের হাত। চোখ পাকিয়ে বলল,

—ইশ, দেখি আমি না ঢুকতে দিলে সুকান্ত কেমন তোকে ঢুকতে দ্যায়।

সুকান্ত ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে এসে গেছে। হাতে বিশ্বজিতের স্যুটকেস। ভারী। প্রকাণ্ড। চাকা গড়িয়ে স্যুটকেসটাকে ফ্ল্যাটে ঢোকাচ্ছিল সুকান্ত, হাসতে হাসতে ফিরে তাকাল— বলেছিলাম না, তৃণা তোকে দেখলেই ঝাড় দেবে।

ছদ্ম ভয়ে বিশ্বজিতের চোখ পিটপিট— তোর বউ কি সত্যি সত্যিই মারধর করবে নাকি রে?

—করবই তো। এতদিন আমাদের ভুলে ছিলি তার শাস্তি নেই?

—কী দিয়ে মারবি? বেলনচাকি, না খুন্তি?

—ঠিক আছে, ভেতরে আয় তারপর দেখছি।

তৃণা হাতটা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ এক লাফে ফ্ল্যাটের ভেতর। চোখ ঘুরিয়ে দেখছে ফ্ল্যাটটাকে। চোখ ঘোরাতে ঘোরাতেই বলল— তোর একটা মিনি এডিশন থাকার কথা না বাড়িতে? কোথায় সে?

—তুই আমাদের এত খবর রাখিস নাকি? তৃণা ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ল না।

—বাহ, পৃথিবীতে একটা মিনি তৃণা এসে গেছে, আমি জানতে পারব না?

—ঘোড়ার মাথা। নিশ্চয়ই সুকান্ত তোকে রাস্তায় বলেছে।

—উঁহু, টেলিপ্যাথিতে জেনেছি। বিশ্বজিৎ সোফায় গা ছড়িয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা দুটোকে তুলে দিয়েছে সেন্টার টেবিলে। পাখার দিকে মুখ তুলে শার্টের বোতাম খুলছে— পুট-পুট, নিয়ে আয়, সে বেটিকে নিয়ে আয়।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল— সত্যি তো, মেয়েটাকে দেখছি না কেন? কোথায় গেল?

—পাশের ফ্ল্যাটে। সরস্বতী নিয়ে গেছে। তৃণা তেরচা চোখে বিশ্বজিতের দিকে তাকাল— জাঁহাপনা, এখন কীভাবে আমরা সেবা করতে পারি আপনার?

—চটপট কফি করে নিয়ে আয়। সারা রাত ট্রেনের চা কফি খেয়ে জিভ হেজে গেছে। শুধু কফি দিবি কিন্তু। নো বিস্কুট ফিস্কুট। তার আগে এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়া তো দেখি।

অবিকল আগের মতোই হুকুমদারি ভঙ্গি। অভ্যাসটা বদলায়নি। চা কফি এখনও শুধুই খায়।

সুকান্ত আর বিশ্বজিৎ গল্প করছে, রান্নাঘর থেকে কান পেতে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল তৃণা। সুকান্তই বলেছে কী সব, ভালো শোনা যাচ্ছে না।

সুকান্তর কথা বলার ধরনটাই এরকম। স্বর সর্বদাই নিচু তারে বাঁধা। উচ্ছ্বাস, বিরক্তি, প্রেম, অপ্রেম সবই বড়ো পরিশীলিত সুকান্তর। তরকে মোড়া। চিরকালই।

বিশ্বজিৎ ঠিক উল্টো। লাগাম ছাড়া। উদ্দাম।

এখনও কী জোরে জোরে হাসছে বিশ্বজিৎ।

তৃণার বুকটা শিরশির করে উঠল।

এক সময় বিশ্বজিতের ওই হাসিতে গমগম করে উঠত যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। এক সময়ে ওই হাসিতেই পুরোপুরি হিপনোটাইজড সেই মেয়েটা। তৃণা বসু। থার্ড ইয়ার কেমিস্ট্রি।

কী বোকা! কী বোকা!

গুব-গুব কফির জল ফুটছে। তৃণা তিন কাপ কফি করে ড্রয়িংরুমে এসে দেখল সরস্বতী ফিরেছে মেয়েকে নিয়ে। সুকান্তর কোলে বসে আছে টুকি, আর তাকে একটুখানি কাছে টানতে প্রাণপণে ডাকাডাকি করে চলেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বজিৎ। মাত্র চোদ্দো মাসের টুকির আপন-পর বোধ বড়ো টনটনে, সে-ও কিছুতেই যাবে না অচেনা আগন্তুকের কাছে।

তৃণা খিলখিল হেসে উঠল— আমার মেয়ে মানুষ চেনে রে!

—তাই তো দেখছি। বিশ্বজিৎ হাল ছেড়েছে এতক্ষণে— মিনি তৃণার খুব গুমোর।

—গুমোর কেন হবে? আমার মেয়ে খুব রিজার্ভড। সহজে উল্টোপাল্টা লোকের কাছে ধরা দেয় না।

—তোর থেকে তা হলে বুদ্ধমতী হবে বল?

—হবেই তো।

শেষ শব্দ দুটোতে হঠাৎই জোর পড়ে গেল। বিশ্বজিৎ কি থমকাল একটু? তৃণা অপ্রস্তুত সামান্য। অকারণেই ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করেছে হঠাৎ। তাড়াতাড়ি কফি খেয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিল সুকান্তকে। মেয়েকে কোলে ঝুলিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল, বেরোল। চটপট ময়দা মাখার জন্য হুকুম ছুড়ল সরস্বতীকে। রান্নার লোকটা এখনও কাজে এল না বলে গজগজ করল।

বিশ্বজিৎ কিন্তু দিব্যি নির্বিকার। আয়েস করে চুমুক দিচ্ছে কফিতে। সিগারেট ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছড়াল— এই, তোদের আজ কী মেনু রে?

—সাসপেন্স। খাবার টেবিলে দেখতে পাবি।

—মাংস হচ্ছে তো? কষা কষা?

—তাও দেখতে পাবি।

—রাঁধছে কে? তুই, না তোর রান্নার লোক?

—যদি আমি রাঁধি, আপত্তি আছে?

—তা একটু আছে বই কী। নুনে পোড়া, চিনি গোলা মাংস আজ আর কিন্তু খেতে পারব না ভাই।

বিশ্বজিতের দেখাদেখি সুকান্তও হাসছে মিটিমিটি— আরে না না, তৃণা এখন অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে।

—পাল্টেছে বলছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—টেস্ট করে দ্যাখ।

—সেই দেখতেই তো আসা। বিশ্বজিতের চোখ নাচছে— কী রে তৃণা, পরীক্ষায় পাশ করবি তো?

তৃণা উত্তর দিল না। ঠোঁটের কোণে শুধু হাসি ফুটল অল্প। অথবা ফুটল না।

দুই

বিশ্বজিৎ স্নানে ঢুকেছে। সুকান্ত বাজারে।

তৃণা জলখাবার তৈরি করছিল। লুচি আর আলুর তরকারি।

ছোটো ছোটো গোল ময়দার লেচি আবর্তিত হয়ে চলেছে। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নিটোল আকার পাচ্ছে ক্রমশ।

তৃণাও ঘুরছিল। এক অদৃশ্য বেলনের চাপে।

...বারুইপুরের বাগানবাড়িতে পিকনিক জমে উঠেছে জোর। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদেয় সকলের পেট চনচন। রান্নার জায়গায় প্যান্ডেমোনিয়াম।

ব্রততী বলছে— ইশ, কত নুন দিয়েছিস রে মাংসে!

—দেখি দেখি। একটু টেস্ট করি।

—এমা, সত্যিই তো। একেবারে নুনকাটা।

মাংসরাঁধুনি তৃণা কেঁদে ফেলেছে প্রায়—কী হবে এখন?

কে যেন বলল, বোধহয় অনুরাধা—একটু মিষ্টি বাড়িয়ে দে না, মেক-আপে হয়ে যাবে।

পড়িমড়ি ছুটেছে তৃণা। বিকেলে কফি করার জন্য যতটা চিনি রাখা ছিল, সবটাই ঢেলে দিল হাঁড়িতে।

শেষ দুপুরে সার-সার পাত পড়েছে বাগানবাড়ির লম্বা চাতালে। মাংসের ঝোল মুখে দিয়েই কোরাসে চেঁচাচ্ছে সবাই— তৃণা তুই ডাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেল। তৃণা তোর বিয়ে হবে না। তৃণা তুই ডাহা ফেল। তৃণা তোর বিয়ে হবে না...

ইচ্ছে করেই কি দিনটার কথা মনে করিয়ে দিল বিশ্বজিৎ? না কথার ছলেই কথা? নাকি বুকে কাঁটাটা রয়ে গেছে বলেই সাধারণ একটা কথাকে অনর্থক জটিল করে তুলেছে তৃণা! মনে মনে।

ছোট্ট একটা আনমনা শ্বাস পড়ল তৃণার।

কাঁটাটাই রয়ে গেল। ফুলটা নেই।

...বারুইপুরের বাগানবাড়িতে কোত্থেকে এক গোলাপ ফুল তুলে এনেছে বিশ্বজিৎ। ইয়া বড়ো। টুকটুকে লাল। ফুল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক।

অঞ্জন ঠাট্টা করে বলল, তুই কি শাজাহানের রোলে অ্যাক্টিং করছিস নাকি?

বিশ্বজিতের চোখ ঢুলুঢুলু, অ্যাক্টিং নয়, অ্যাক্টিং নয়। আমি এখন রিয়েল শাজাহান। ইন সার্চ অফ মাই মমতাজমহল।

—ফুলটা কি তার জন্য?

—অফকোর্স। তাকে পেলে তারেই দিব বুকের এই গোলাপখানি।

খ্যাপা। একদম খ্যাপা।

বিশ্বজিতের খ্যাপামি কলেজ বিখ্যাত। রীতিমতো প্রবাদ। নিত্যনতুন কী যে সব অদ্ভুতুড়ে শখ চাগাড় দিয়ে ওঠে পাগলাটার মাথায়! একবার বেশ কিছুদিন পকেটে একটা সাদা ইঁদুর নিয়ে আসতে শুরু করল ক্লাসে। সুতোয় বাঁধা ইঁদুর যখন-তখন ক্লাসরুমে ছেড়ে দিচ্ছে। সুতোর প্রান্ত ধরে ছোটাচ্ছে প্রাণীটাকে। একবার এর গায়ে, একবার ওর গায়ে। কখনো শাড়িতে, কখনো সালোয়ার কামিজে। ক্রসকান্ট্রি রেস। রাজেশ্বরী তো একদিন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল ভয়ে। সে এক বিদিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি। আরেকবার তো মহা বিভ্রাট। ল্যাব থেকে ইথাইল অ্যালকোহল চুরি করে খেয়ে ফেলল বিশ্বজিৎ। নেশা হয় কি না দেখার জন্য। ভাগ্যিস দু-ঢোক খাওয়ার পরেই হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে বন্ধুরা! তাও বমি-টমি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেলেঙ্কারি! মাঝে তো ক-দিন উধাওই হয়ে গিয়েছিল গেরুয়া পরে। সন্ন্যাসী হবে। মাধুকরী করে কাটাবে জীবন। উপোসে শুকিয়ে কাঠি হয়ে বিশাখাপত্তনম থেকে ফিরে এল।

সেই বিশ্বজিৎ করে পুষ্পচয়ন! পারেও বটে!

গোলাপটাকেও তাই নতুন পাগলামি ভেবে হাসাহাসি করছে বন্ধুরা। মেয়েরা তো বেশি করে। শুধু তৃণার মনই যে কেন অন্য কথা বলে।

...শেষ বিকেলে যখন বাগানবাড়িতে ঝাঁকড়া লিচুগাছের নীচে ফুল হাতে উদাস শুয়ে আছে বিশ্বজিৎ। একা একা।

ভিড় এড়িয়ে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেছে তৃণা, গোলাপটা প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারলি না?

শুয়ে শুয়েই তৃণাকে দেখছে বিশ্বজিৎ। প্রাণ ভরে শুঁকল একবার গোলাপটাকে, দেব?

তৃণার গলা গভীর, গোলাপটা তুই কাকে দিতে চাস, আমি জানি।

—তুই কি জ্যোতিষচর্চা শুরু করেছিস নাকি? দাড়ির আড়ালে বিশ্বজিতের মুখ ঝিকঝিক।

তৃণা দুম করে বলে ফেলল, দে, ফুলটা আমাকে দে।

বিশ্বজিৎ তড়াক করে উঠে বসল, তোকে। কেন?

মুহূর্তের জন্য ব্রীড়ায় আনত তৃণার মুখ। পরক্ষণে বিব্বোক হেনেছে, আমি নিজে থেকে চাইছি, তুই আমাকে দিবি না?

বিশ্বজিৎ সময় নিচ্ছে। আচমকা বলে উঠল, চল, আমার সঙ্গে তাহলে এক্ষুনি পালিয়ে চল।

—কোথায়?

—প্রশ্ন নয়। যাবি কি না বল?

—পাগলের মতো কথা বলিস না।

বিশ্বজিৎ হ্যা হ্যা হেসে উঠল— ভয় পেয়ে গেলি তো?

তৃণা নীরব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বজিৎ ফুলটা বাড়িয়ে দিয়েও সরিয়ে নিল— নাহ, এ-ফুল তোকে দেওয়া যায় না। দেওয়া উচিত নয়।

—থাক। চাই না আমি।

—রাগ করিস কেন? তোকে গোলাপ দেবে অন্য কেউ। নবীন জাদুকরের মুখ থেকে হাসি মুছেছে পুরোপুরি— তুই সুকান্তকে ফেরাস না তৃণা। ছেলেটা সেই কবে থেকে তোর জন্য বাটনহোলে লাল গোলাপ লাগিয়ে বসে আছে, সে-খবর রাখিস?

থাকুক। থাকুক।

তৃণা মানতে চায়নি। তৃণা অবুঝ হয়েছিল। তৃণা তর্ক জুড়েছিল। তৃণা জোর করে কেড়ে নিতে চেয়েছিল গোলাপটাকে।

অটল বিশ্বজিৎ রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিল তৃণাকে। একটা পিতল রঙের বিকেল সিসেবরন হয়ে গেল।

কী অপমান! কী অপমান!

তৃণাকে দেখলে এড়িয়ে যায় বিশ্বজিৎ। তৃণাকে দেখলে ভিড় খোঁজে।

কীভাবে যে ইউনিভার্সিটির শেষ ক-টা বছর কেটেছিল!

একদিকে ভালোই হয়েছে। কার সঙ্গে নীড় বাঁধা ভালো? যাকে তৃণা ভালোবাসে তার সঙ্গে? নাকি যে তৃণাকে সত্যি সত্যি চায়, তার সঙ্গে? সুকান্ত কি কম ভালোবেসেছে তৃণাকে! সুকান্তর মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান আছে, বাস্তববুদ্ধি আছে। তৃণার জন্য সর্বগ্রাসী আকুলতাও আছে একটা। এর বেশি আর কী চায় নারী!

তবু যে কেন তৃণার বুক ঢিপঢিপ!

বিশ্বজিৎ-এর চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই! এত দিন পরেও!

স্পিড পোস্টে চিঠিটা এল পরশুদিন। কানাডায় চলে যাচ্ছে বিশ্বজিৎ। দেশ ছাড়ার আগে কুচবিহার যাবে আগে। বাবা মা-র সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে সকালের ট্রেনে কলকাতা এসে প্লেন ধরবে পরদিনই ভোরে। একটা পুরো দিন তৃণাদের বাড়িতে থাকতে চায় বিশ্বজিৎ। সুকান্ত যেন অতি অবশ্য স্টেশনে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন এসেছে বিশ্বজিৎ? তার প্রত্যাখ্যানে যে-সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্কটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাজিয়ে দেখতে চায়? যাওয়ার আগে?

কে জানে!

তিন

স্নান সেরে বেরিয়েছে বিশ্বজিৎ। বেরিয়েই যথারীতি শুরু হয়েছে হাঁকডাক— কীরে, খেতে-টেতে দিবি? পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে।

সরস্বতীকে রান্নাঘরের দায়িত্বে রেখে ডাইনিং টেবিলে এল তৃণা— নে। খা।

—এ কী রে! বিশ্বজিৎ-এর চোখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি— ক-টা লুচি দিয়েছিস? দুপুরে কিছু খেতে না-দেওয়ার মতলব আছে নাকি?

—কিছু বেশি দিইনি। খেয়ে নে। দুপুরে যা মেনু আছে, খিদে না-থাকলেও ঠিক খেয়ে নিবি।

—কী মেনু?

—বলছি না সাসপেন্স। তৃণা ঠোঁট টিপে হাসছে— দেখিস আজ, নুন মিষ্টি সব ঠিকঠাক থাকে কি না।

কথাটা যেন কানেই ঢুকল না বিশ্বজিতের। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে লুচি ছিঁড়ছে।

তৃণা খাওয়াটা দেখছিল। এখনও বিশ্বজিৎ আগের মতোই গোগ্রাসে গেলে। যেন এক্ষুনি কেউ কেড়ে নেবে থালাটা।

একটা মায়া জাগছিল তৃণার। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল— হ্যাঁ রে, তুই যে চলে যাচ্ছিস, তোর মা বাবার কী হবে?

—কী আবার হবে! যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

—তোর তো আর ভাইবোন নেই, বিপদে-আপদে দেখবে কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কলকাতায় যখন পড়তে এসেছিলাম তখন কে দেখছিল? বাইরে বাইরে চাকরি করে বেড়াচ্ছি, এখনই-বা দেখছে কে?

—তাও তো দেশেই ছিলি। কাছাকাছি।

—দুর, বাবা-মা-র আমাকে ছাড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। খাগড়াবাড়ি আর মদনমোহনতলা করে দিব্যি দু-জন বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বলতে বলতে মুখ তুলেছে বিশ্বজিৎ, পৃথিবীতে কারো জন্যই কোথাও কিছু আটকায় না রে।

তৃণা চুপ একটুক্ষণ। কথা খুঁজছে। ঠিক ঠিক সময়ে কথা না-এলে কী যে চাপ বাড়ে মনের ওপর! চাপটাকে তাড়াতে আনতাবড়ি বলে উঠেছে, তুই এখনও বিয়ে করলি না কেন? বয়স হলে তোকে দেখবে কে?

সঙ্গেসঙ্গে উত্তর এসে গেছে— বয়স হবে কী রে? বয়স তো হয়ে গেছে। দেখছিস না চুলে পাক ধরেছে?

—ফাজলামি করিস না। পঁয়ত্রিশ বছর আবার একটা বয়স নাকি? বলিস তো মেয়ে দেখি। টুপ করে কানাডা থেকে এসে টোপর পরে যাস।

—মাথা খারাপ! আমি বলে ওই ভয়েই মানে মানে কাটছি। আবার ফিরব গাঁটছড়া বাঁধতে?

—বুঝেছি। বুঝেছি। বিদেশে গিয়ে মেম বিয়ে করার শখ হয়েছে।

—না রে ভাই। মেম-টেম আমার পোষাবে না। আমি হলাম গিয়ে পাত পেড়ে খাওয়া পার্টি, আমার কি কাঁটা-চামচ বউ চলে? পাঞ্জাবের তন্দুরিই বলে হজম করে উঠতে পারলাম না।

—কীরকম? কীরকম? তৃণার বুকে চকিত কৌতূহল।

—সে এক মজার কাহিনি। মাঝে কয়েক দিন চণ্ডীগড় থেকে সোলানে গিয়েছিলাম চাকরি করতে। মদের কারখানার কেমিস্ট। তা হল কী, সেখানে আমার বস ছিল এক পাহাড়ের মতো সর্দার। দুম করে সর্দারজির মেয়ে আমার প্রেমে পড়ে গেল। যখন-তখন আমার কোয়ার্টারে এসে হানা দেয়। যত বলি ওগো ছাড়ান দাও, কোম্‌লি নেহি ছোড়তি। ছোট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাউন, ওখানে কোনো কথাই কারো কাছে গোপন থাকে না, সর্দারজিও একদিন জেনে গেল ব্যাপারটা। কিংবা কে জানে মেয়েও হয়তো বলে থাকতে পারে। শুনেই সর্দারজি চড়াও আমার ওপর। পারলে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শতদ্রু বিপাশায় ছুড়ে ফেলে দেয়।

—মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—উঁহু, প্রেমে সাড়া না-দেওয়ার জন্য। একটা মেয়ে যেচে তোমার কাছে প্রেম নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও, এত বড়ো সাহস! তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।

তৃণার চোখ স্থির— তারপর?

—তারপর আর কী। আমি ল্যাজ গুটিয়ে ব্যাক টু চণ্ডীগড়। তা সেখানেও ধাওয়া শুরু করল মেয়েটা। আমাকে ছাড়া নাকি বাঁচবে না। বাপস জব ভাউচারটা পেয়ে জোর বেঁচেছি।

তৃণার চোখের পাতা অচঞ্চল তবু— মেয়েটা বুঝি দেখতে ভালো নয়?

—নাহ। সুন্দর। সুন্দরই। গুড ফিগার, টানাটানা চোখ, টকটকে রং। হিস্ট্রি না পলিটিকাল সায়েন্স কীসে যেন এম.এ.। গুরু নানক ইউনিভার্সিটির। গজলের গলাটিও খাসা।

—বিয়েটা তাহলে করলি না কেন?

—ওই, হয়ে উঠল না। ভাবলাম আটকা পড়ে যাব। বিশ্বজিৎ কথা ঘোরাতে চাইছে এবার— সুকান্তটা এখনও ফিরল না কেন রে বাজার থেকে?

তৃণা তবু খোঁচাচ্ছে বিশ্বজিৎকে— কথার উত্তর দে আগে। বিয়ে কি গারদ, যে আটকা পড়ে যাবি?

—গারদ নয় বলছিস?

—নয়ই তো। সুকান্তকে দেখে বুঝছিস না?

বিশ্বজিৎ খাওয়া শেষ করেছে। বেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। ফিরে এসে হাত মুছছে তোয়ালেতে। প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বদলেই ফেলল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর মেয়েটা কিন্তু দারুণ দেখতে হয়েছে। বার্বি ডলের মতো মুখ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তোর সঙ্গেই বেশি মিল, না রে?

তৃণা হেসে ফেলল, কথা ঘোরাতে তোষামোদ শুরু করলি কেন?

—ধরে ফেললি? বিশ্বজিৎ হেসে উঠেছে শব্দ করে, তুই বেশ চালাক হয়েছিস দেখছি।

—তোর কি ধারণা বোকাই থাকব?

—থাক। আর ঝগড়া করিস না। বিশ্বজিৎ হাসি ধরে আছে মুখে—যা তোর মেয়েটাকে নিয়ে আয়। একটু আদর করি।

—ওকে তো আর আনা যাবে না। তৃণা মজা করল একটু।

—কেন?

—তোর মিনি তৃণা ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলেও জাগবে না।

—স্ট্রেঞ্জ! এই তো জেগে ছিল! আমাকে কাটানোর জন্য মেয়েটাকে ক্লোরোফর্ম-টোরোফর্ম করে দিলি নাকি?

—দিতেও পারি। তৃণার হাসি বাড়ল। অকারণে হাসছে খিলখিল—কাজের কথায় আয়। তোর গোলাপটা তাহলে এখনও কাউকে দেওয়া হল না?

বিশ্বজিৎ সিগারেট ধরিয়েছে। রহস্যময় ধোঁয়া ভাসাচ্ছে হাওয়ায়, গোলাপটার কথা তবে এখনও তোর মনে আছে?

তৃণা মনে মনে বলল, ভুলতে পারলাম কই!

চার

দুপুরে জব্বর হল খাওয়াটা। ইলিশ মাছ, ভেটকির ফ্রাই, পোলাও, মাংস, রসমালাই। খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল বিশ্বজিৎ। শুনতে শুনতে পুলক জাগার থেকেও তৃণার অস্বস্তি হচ্ছিল বেশি। সুকান্তর চোখ দুটোও হাই মাইনাস পাওয়ারের পিছন থেকে প্যাটপ্যাট হাসছিল যে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়েদেয়ে খানিকটা ভাতঘুম দিল বিশ্বজিৎ। ও ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে। তার পর উঠে বিকেল নাগাদ বেরোল সুকান্তকে নিয়ে। টুকিটাকি কী যেন সওদা করবে। পুরোনো দু-একজন বন্ধুকেও মুখ দেখিয়ে আসবে একবার।

ফিরল সন্ধের অনেক পরে। সঙ্গে দু-হাত ভরতি খেলনা। টেডি বিয়ার, দম দেওয়া রোবট, চোখ পিটপিট পুতুল, লাল বল। খেলনা দেখিয়ে টুকির সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে বিশ্বজিৎ। টুকি তবু সুকান্তর কোলে অনড়।

বিশ্বজিৎ টুকির চুল ঘেঁটে দিল— আয় না একবার প্লিজ আয়।

টুকি মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাদামি ভাল্লুকের থেকে সুকান্তর কোলই এখন বেশি পছন্দ তার।

বিশ্বজিৎ নিজেই এবার নাচতে শুরু করেছে। অঙ্গভঙ্গি করছে বিচিত্র। হাসছে। লাফাচ্ছে। বিটকেল সুরে রাইম শোনাচ্ছে টুকিকে।

টুকি যেন একটু একটু মজা পেয়েছে এবার। সুকান্তর কোল থেকেই বিশ্বজিতের দিকে আঙুল দেখাল— মাম্‌মা।

—মামা কী রে? বিশ্বজিৎ থমকে দাঁড়িয়েছে— জেঠু বল।

টুকি আবার বলে উঠল— মাম্‌মা।

—না জেঠু।

—মাম্‌মা।

—মামা ডাকটা কে শেখাল রে? বিশ্বজিৎ হার মেনে হাসছে এতক্ষণে— তুই নিশ্চয়ই?

তৃণার মজা লাগল— কেন মামা ডাকে তোর আপত্তি আছে?

—আপত্তি করলেই-বা শুনছে কে? এখন তো আর আমি ওকে কিছুই কমিউনিকেট করতে পারব না!

হাসি ছড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গেল বিশ্বজিৎ। বোধ হয় গোছগাছ সারতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে জোর আড্ডা জমল। বহুকাল পর। তিন বন্ধুর। শেষ আড্ডা।

কথায় কথায় সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল বিশ্বজিৎকে— তুই কি কানাডায় পাকাপাকি ভাবে থেকে যাবি ঠিক করেছিস?

বিশ্বজিৎ গুছিয়ে বসেছে চেয়ারে— পাগল! এ বান্দা কোনো এক জায়গায় বাঁধা থাকে না।

—তাহলে?

—গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। জানিস তো এককালে গ্লোবট্রটার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার? একবার যখন বেরোতে পেরেছি, এরপর কানাডা থেকে ইউ.এস.এ.-তে ঢুকে পড়ব। নায়াগ্রা, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, মার্টোগ্রাসো, কিচ্ছু ছাড়ব না। তারপর আসব ইউরোপে। আফ্রিকার দিকেও যেতে পারি।

—তারপর?

—তারপর এশিয়া। বোখারা। সমরখন্দ চিনের পাঁচিল গোবি মরুভূমি।

—তারপর?

—অস্ট্রেলিয়াও যেতে পারি।

—তারপর?

এবার আর চটজলদি উত্তর নেই বিশ্বজিতের। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাচ্ছে তৃণার দিকে, একবার সুকান্তর দিকে।

তৃণার চোখে ব্যঙ্গ ফুটল, শরীরের জোশ যখন মরবে, তখন কী গতি হবে তোর?

বিশ্বজিৎ ঝপ করে বলে বসল— আচ্ছা, তখন যদি তোদের কাছে ফিরে আসি, একটু জায়গা মিলবে না?

—আমাদের কাছে! তৃণার মুখে অপার বিস্ময়, তুই এখানে আসবি?

—বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাব বল। বিশ্বজিৎ হাহা হাসছে— ভেবে দেখ, তখন কিন্তু অনেক মালকড়ি থাকবে আমার কাছে। আই উইল বি আ সলভেন্ট ম্যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও ঠাট্টা? এখনও মজা?

তৃণার স্বর তীক্ষ্ণ হল, সত্যি আসবি তুই?

বিশ্বজিৎ হেসেই চলেছে, তখন আর তাছাড়া গতি কী!

বৈশাখের নীল রাত ভারি মনোরম এক বাতাস ছড়াচ্ছে। বাতাসটাকে বুক ভরে টানতে চাইল তৃণা। বহু বছর পর। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তিন বেতের চেয়ারে তিনটে বুড়ো-বুড়ি বসে আছে। অনেকটা পথ ঘুরে আসা এক বৃদ্ধ কথা বলে চলেছে একটানা, এক বৃদ্ধ শুনছে, আর এক বৃদ্ধা নয়ন ভরে দেখছে দুই বৃদ্ধকে।

ছবিটা কী নিষ্পাপ। কী মধুর!

পাঁচ

কাকভোরে চলে গেছে বিশ্বজিৎ। বন্ধুকে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে গিয়েছিল সুকান্ত, ফিরে এসে আবার গড়িয়েছে বিছানায়। মেয়েকে আঁকড়ে ধরে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তৃণা পায়ে পায়ে পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। একটা মাত্র দিনের জন্য এসেছিল বিশ্বজিৎ। একদিনের জন্য সব ছড়িয়ে, আবার গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বন্ধ ঘরে এখন শুধুই এক হাহা শূন্যতা।

নাহ্, শূন্যতা কোথায়। তৃণা যে চোখ বুজলেই অনুভব করতে পারছে গন্ধটাকে। গোটা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে গন্ধটা। একটা টাটকা গোলাপের সৌরভ। ইয়া বড়ো। টুকটুকে লাল।

যাওয়ার আগে বিশ্বজিৎ তবে ফুলটাই দিতে এসেছিল তৃণাকে? নাকি এও শুধু তৃণারই মনগড়া উপলব্ধি?

তৃণা জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইরাস

দুপুরে খেয়ে উঠে সবে বই খুলে বসেছে শ্রেয়া, ভোরবেলে পাখির কিচিরমিচির। ঘরে থেকেই শ্রেয়া টের পেল, মা খুলেছে দরজা, কথা বলছে কার সঙ্গে। সেলসম্যান? উঁহু, চেনা চেনা গলা। হ্যাঁ যা ভেবেছে তাই। শ্রীমান ইমন।

শ্রেয়া তেমন একটা আহ্লাদিত হল না। ইমন লেখাপড়ায় খুব ভালো, তার বন্ধুও বটে, কিন্তু স্বভাবটা বড়ো খারাপ। তিন-তিনটি টিউটরের কাছে পড়ছে, তবু অন্যরা কে কী নোটস পেল, কারো কাছে কোনো বাড়তি সাজেশান আছে কি না, জানার জন্য ছোঁকছোঁক করা চাই। অথচ নিজের চোতাগুলো তিনি ভুলেও বন্ধুদের দেখাবেন না! আজ এখানে হঠাৎ হানা দিল কী মতলবে? মুখটা তাও হাসি হাসি রেখেই শ্রেয়া বলল, তুই হঠাৎ?

জিন্‌স আর কালো টি শার্ট পরা পাঁচ-দশ হাইটের ইমন কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকাল। বাঁ-হাতে চশমা সেট করতে করতে বলল, এলাম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই অড টাইমে...?

—কিটোন, অ্যালডিহাইডে ব্রেনটা পুরো হ্যাং করে গেছে রে!

—তুই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ধরে ফেলেছিস? কদ্দূর এগোলি?

—ধুস, একটাও ফর্মুলা মনে থাকছে না। বিটকেল বিটকেল বন্ডগুলো শুধু সাঁইসাঁই চরকি খাচ্ছে। যত্তসব ঢপবাজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেয়া মুখ বেঁকাল, সে কী রে? হল কী আমাদের গুডবয়ের?

—আওয়াজ দিচ্ছিস? দে। ইমন মোড়া টেনে বসেছে। নাকটা কুঁচকে বলল, আমার ব্রেনে একটা ভাইরাস ঢুকে পড়েছে রে!

—তুই বুঝি আমাকে ডিসটার্ব করতে এলি?

—এক আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হলে কী হয়!

—তোর পড়ার সময়ে তো এ-কথা চলে না! তখন গেলে তো মাসিমা বেমালুম বলে দেন, বাবুন নেই...! শ্রেয়া বলতে গিয়েও চেপে গেল। সামান্য হুল ফুটিয়ে বলল, আমরা তো তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট নই। পরীক্ষার আগে আমাদের এভরি মোমেন্ট কাউন্টস।

—ধুস, এখনও তো ফাইনালের ঢের দেরি।

—কোথায় দেরি! একমাসও নেই!

—আটাশ দিন মানে প্রিটি লং টাইম। এর মধ্যে কত কী ঘটতে পারে, জানিস? একটা আর্থকোয়েক, খান দুই সাইক্লোন, এমনকী, গোটাচারেক বাংলা বন্ধ হওয়াও অসম্ভব নয়।

—অ্যাই অ্যাই, বন্ধের নাম নিস না, প্লিজ, শ্রেয়া প্রায় আঁতকে উঠেছে. আমার প্রিপারেশনটাই ঘেঁটে যাবে। মাধ্যমিকের সময়ে বন্ধ পড়ে কী কেলোটা হয়েছিল, বাপ্‌স! হিস্ট্রি পেপারটাই ঝুলে গেল।

—এগজ্যামে ভালো-খারাপটা চান্স ফ্যাক্টর। ঠিক দিনে হলে আমি তো হিস্ট্রিতে ঝাড় খেতাম।

—ওই আশাতেই বুঝি এবারও বন্ধ কামনা করছিস?

—না না, জাস্ট একটা কথার কথা বলছিলাম।

—যত্তসব খারাপ চিন্তা, শ্রেয়া ইচ্ছে করে একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। আলতো স্বর ভাসিয়ে বলল, তোর আজ টিউশন নেই?

ওস্তাদ ছেলে। ইঙ্গিত ধরে ফেলেছে। মুখটা গোমড়া করে বলল, চলে যেতে বলছিস?

—না না, বসতে পারিস। তবে বেশি গ্যাঁজালে মা কিন্তু ঝাড় দেবে।

—মাসিমা আজ স্লাইট ডাউন আছেন, তাই না? কিছু ঘটেছে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ঘটা-ফটা লাগে না। মা-র আজকাল সারাক্ষণই টেম্পার গরম। উঠতে-বসতে চেঁচামেচি করছে। স্নান করে উঠে জাস্ট টিভিটা খুলেছি, অমনই ফায়ার। তোমার সিরিয়াল দেখা আমি ঘুচিয়ে দেব, কেব্‌ল কানেকশন কেটে দেব...!

—আমার মা-র তো গুচ্ছ গুচ্ছ টেনশন। বাবাকে গ্রিপে পায় না, ঝাল ঝাড়ে আমার উপর। কেরিয়ার কেরিয়ার করে কান ঝালাপালা করে দিল।

—তোর আবার কেরিয়ারের ভাবনা, হুঁ! জয়েন্টে বসছিস, টপের দিকে থাকবি, জে ইউ শিবপুর একটা তো তোর বাঁধা। আর তারপর বিন্দাস লাইফ।

—সে তো তুইও জয়েন্ট দিচ্ছিস!

—নাম-কা-ওয়াস্তে। বাবা জেদ করছে, তাই। দশ হাজারের উপরে র‌্যাঙ্ক পাব না, কাউন্সেলিংয়ের পর হয়তো বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়া... আর ওসব জায়গায় ক্যাম্পাসিং হবে কি না তারও তো ঠিক নেই, অতএব চাকরিও তোর মতো হাতের মোয়া নয়!

—নিজেকে এত আন্ডার-এস্টিমেট করছিস কেন?

—কারণ আমার দৌড়টা আমি জানি । আমি তো আর তুই নই। ফার্স্ট ডিভিশনটি পেলেই আমার কাফি। জেনারেল লাইনে থাকব, ফিজিক্স কিংবা ম্যাথস কোনো একটাতে বডি ফেলে দেব। ইংলিশেও শিফ্‌ট করে যেতে পারি অবশ্য। ইমনের মণি সহসা স্থির। দেখছে শ্রেয়াকে। একটু পরে বলল, তুই ফিউচার নিয়ে খুব ভাবিস, তাই না রে?

—নেকু। তুই যেন ভাবিস না!

অবাক ইমন একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলায় কেমন নাটুকে সুর, এখন ওসব ভাবনা আমার মাথায় নেই রে শ্রেয়া। প্রোগ্রামিং একসময় হয়তো করা ছিল, হঠাৎ সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

—কিঁউ?

—ওই যে বললাম, একটা ভাইরাস....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তো স্ক্যান করে ভাইরাসটাকে খোঁজ। তারপর অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে সাফা করে দে।

—অত ইজি হবে কি? মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরে এন্ট্রি নিয়েছে, এখন একে তাড়ানো... ইমন দু-দিকে ঘাড় নাড়াল, মুশকিল হি নেহি, নামুমকিন হ্যায়।

এতক্ষণে শ্রেয়ার ভুরুতে ভাঁজ। ইমনের স্বর যেন কেমন কেমন ঠেকছে! একটু যেন লতলতে। সরু চোখে শ্রেয়া বলল, মাথায় ভূত ঢোকেনি তো? আই মিন, কোনো পেতনি?

ইমন চমকে তাকিয়েছে।

শ্রেয়া মুচকি হাসি হাসল। চোখ নাচিয়ে বলল, কেসটা কী অ্যাঁ? কোথায় লগ ইন করেছিস?

—আরে না, সেসব কিছু নয়, ইমন যেন জোর করে সপ্রতিভ হচ্ছে। সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, এখন তুই কোন সাবজেক্ট ধরেছিস?

—ম্যাথস। টেস্ট পেপার সল্‌ভ করছি।

—হচ্ছে?

—হচ্ছে। হচ্ছে না। জাস্ট চলছে আর কি।

—ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনগুলো করছিস তো?

—স্টিয়ারিং ঘোরাস না, স্টিয়ারিং ঘোরাস না। শ্রেয়া খিলখিল হেসে উঠল, ঝেড়ে কাশ তো কেসটা কী!

—কোন কেস?

—ওই তোর পেতনি। কে রে?

—বললাম তো...সে-রকম কিছু নয়।

—তার মানেই সামথিং সামথিং। তোর ফেস বলে দিচ্ছে...

—কী বলছে?

—তুই গিয়েছিস।

ইমন যেন শুনতেই পেল না। হঠাৎই ভারি উদাস। সিলিং দেখছে, ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকাল, জানালার গ্রিলে চোখ ফেলছে...

বন্ধুর দশা দেখে এবার বেশ মজা লেগেছে শ্রেয়ার। ঠোঁট টিপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, কেন এত পোজ দিচ্ছ বস? আমাকে ইনফর্ম করার জন্যই তো এসেছ। ব্লাশ না-করে বলে ফেলো।

ইমন হাত উলটোল, কী বলি বল তো? ব্যাপারটা তো এখনও নাথিং।

—তার মানে ওয়ান-সাইডেড? তোর একটা উইকনেস জন্মেছে, কিন্তু ফলটা এখনও পাকেনি, তাই তো?

—ছাড় না। এত ক্রস করছিস কেন?

—তোরই-বা এত হাশ-হাশ কীসের?

—বলছি তো কিছু নয়।

—তুইও বললি, আমিও মেনে নিলাম, অ্যাঁ? শ্রেয়া চোখ তেরচা করল, কে? কে? মেয়েটা কে?

ইমন নিশ্চুপ।

—অ্যাই ভেবলুরাম, বল না? শ্রেয়ার কৌতূহল ক্রমশ উচ্চে, আমাদের ক্লাসের কেউ কি? শ্রী? জয়ী? লিপিকা? সায়ন্তনী? প্রজ্ঞাপারমিতা?

—না না, ওরা কেউ নয়।

—তাহলে? তোদের পাড়ার সেই মেয়েটা? যে তোকে ঝাড়ি মারে?

—ধুর, ওটা তো বাচ্চা। নাইনে পড়ে।

—আহা তুই যেন কত ধাড়ি!

—শি ইজ ইমম্যাচিয়োর।

—তার মানে তুই যার সঙ্গে ছকের ধান্দায় আছিস সে খুব ম্যাচিয়োর?

ইমনের মুখে আবার কুলুপ, শ্রেয়া ফের খোঁচাল, অল রাইট, আইডেন্টিটি নয় নাই ডিসক্লোজ করলি! তাকে দেখতে কেমন?

শ্রেয়ার চোখে ঝলক রেখে ইমন ঘাড় ঝুলিয়ে ফেলল।

—ব্যাপক বোকামি করছিস তো! ভালো দেখতে কি না, তাও বলতে পারছিস না?

এবার ইমনের মিনমিনে জবাব, ভালোই তো।

—শুধু ভালো? না ঝাক্কাস?

—নট কিউটার দ্যান ইউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মাসকা মারিস না। সে থাকে কোথায়, অ্যাঁ?

—এদিকেই।

—কী পড়ে?

—এইচ.এস.ই তো দেওয়ার কথা।

—কথা মানে? ড্রপ দিচ্ছে নাকি?

—না না, বসবে এগজ্যামে।

—তোকে সে লাইক করে?

—মনে তো হয় করে।

—তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? বুক ঠুকে এগিয়ে যা।

—অসুবিধা আছে।

—কীরকম?

—আমি যে ওকে লাইক করি, সেটা যদি ও লাইক না-করে, তাহলে রি-অ্যাকশনটা আমি লাইক করতে পারব কি না, বুঝতে পারছি না।

শ্রেয়ার গুলিয়ে গেল, বিড়বিড় করে বলল, বুঝলাম না।

—ভাবছি, যদি সে খারাপভাবে নেয়? যদি আউটরাইট আমাকে রিজেক্ট করে?

—রিসাইকেল বিনে গিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবি। পরে যদি কখনো তোলে, এই আশায়।

—টিজ করছিস শ্রেয়া? ইমনের মুখ বড়োই করুণ, তুই একটু সাজেস্ট কর না, কীভাবে নেক্সট স্টেপটা ফেলা যায়।

—স্ট্রেঞ্জ! আমি কী জানি!

—আহা, মেয়েরা তো এসব ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ হয়...

—নো ভাট বকোয়াস। আমি কি ছেলেদের লাইন মেরে বেড়াই নাকি?

—সৌম্যরূপের সঙ্গে কিন্তু তোর একটা ইন্টিমেসি ছিল।

—সৌম্য ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড ইমন। ওয়াজ কেন, এখনও আছে। নাথিং মোর, নাথিং লেস।

—বলছিস, কিন্তু জয়ী যে অন্য রিপোর্ট দিয়েছিল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তুই চুপকে চুপকে আমার খবর নিস বুঝি? শ্রেয়ার দৃষ্টি খর, তবে শুনে রাখ, জয়ী মিথ্যে বলেছে। ও নিজেই সৌম্যর জন্য ফিদা।

—তাই বল। ইমনের মুখ ঝকঝক করে উঠল, তুই তাহলে ক্লিন?

—তোর সন্দেহ ছিল বুঝি?

—না মানে... তোকে কেউ কখনো প্রোপোজও করেনি?

—আমি অ্যালাও করলে তো।

—ধর কেউ যদি ফস করে বলে বসল... ইমন মাথা চুলকোচ্ছে, হাউ উইল ইউ রিঅ্যাক্ট?

—সেটা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে। অ্যান্ড অন হিম, হু প্রোপোজেস। যদি তাকে লাইক করি, তো বলব, নো জলদবাজি, আভি ওয়েট করো। আর পছন্দ না-হলে দেন অ্যান্ড দেয়ার খাল্লাস।

—ফরএভার?

—কী করব, আমার কম্পিউটারে রিসাইকেল বিন নেই যে, বলেই শ্রেয়া থমকেছে, কিন্তু আমি এখানে আসছি কোথা থেকে?

—আমি জাস্ট তোকে মেয়েটার জায়গায় প্লেস করে বুঝতে চাইছি।

—হোয়াই মি?

—জাস্ট একটা স্টাডি কেস।

শ্রেয়া ভুরু বেঁকিয়ে তাকাল, তা, কী নলেজ গ্যাদার করলি?

—করলাম... বলতে বলতে ইমন খপ করে শ্রেয়ার হাতটা চেপে ধরেছে, এবার মনে হচ্ছে অর্গ্যানিকটা গ্রিপে এসে গেল। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

শ্রেয়া কোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর আগেই ঝটাকসে উঠে দাঁড়িয়েছে ইমন। পরক্ষণে ঝড়ের গতিতে উধাও।

স্তম্ভিত মুখে বসে আছে শ্রেয়া। সামনে টেস্টপেপার খোলা, কিন্তু একটা অঙ্কও ঢুকছে না মাথায়। মনই বসছে না।

নাহ ইমনের স্বভাবটা সত্যি খুব খারাপ। দিব্যি কেমন পরীক্ষার আগে ভাইরাসটা শ্রেয়াকে পাস করে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনায় এসে

পুরোনো আমলের খাটখানা চমৎকার সাজানো হয়েছে আজ। ছত্রি থেকে ঝুলছে সার সার রজনীগন্ধার ছড়া, বাজুতে গোলাপের বাহার, মোটা মোটা দু-খানা জুঁইয়ের মালা শোয়ানো আছে বালিশে, বিছানার নতুন চাদরে রাশি রাশি রঙিন পাপড়ি। ফুলের শোভা আর সুরভিতে গোটা ঘর যেন মাতোয়ারা।

পর্দা সরিয়ে ঢুকেই মানবেন্দ্র থমকালেন। চোখ পিটপিট করে নিরীক্ষণ করছেন পুষ্পসজ্জা। আজ যা চলছে, কোনো কিছুতেই তাঁর বিস্মিত হওয়ার কথা নয়। তবু বলে উঠলেন, কী কাণ্ড, এটা আবার কখন হল?

নির্মলা তাঁর নিজস্ব কাঁসার ঘটিখানা উঁচু করে ঢকঢক জল খাচ্ছিলেন। হাতের পিঠে কষ মুছে নিয়ে বললেন, দেখো, দেখো তোমার নাতি-নাতনিদের কীর্তি। ফুলের দোকান থেকে লোক এনে, সারাসন্ধে দরজা বন্ধ করে এসব করেছে, কোনো মানে হয়?

মানবেন্দ্র হেসে ফেললেন। মজা করার সুরে বললেন, আহা মন্দ কী! ফুলশয্যাটি না-হলে কি আজ ষোলো কলা পূর্ণ হত?

—ঢং কোরো না তো। যত সব ধ্যাষ্টামি। চিতায় পা বাড়িয়ে রয়েছি, এখন কিনা ফুলশয্যা!

—এ পা চিতায় বলেই তো বেশি মধুর লাগছে গো। মনে হচ্ছে যৌবন যেন ফিরে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হুঁউউউ, বাবুর পুলক দেখে মরে যাই। নির্মলা ভুরু বেঁকিয়ে কটাক্ষ হানলেন, তলে তলে তোমার উসকানি ছিল না তো?

—মোটেই না। এমন একটা অনুষ্ঠান হবে তাই তো জানতাম না।

কথাটা মিথ্যে নয়। ঘটাপটা করে বাবা-মার বিয়ের পঞ্চাশ বছর পালন করার পরিকল্পনাটা আদতে মেয়ে-জামাইয়ের। ছেলে, ছেলের বউও তালে তাল দিয়েছে। সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ নাতি-নাতনিরা তো আছেই। পুরো আয়োজনটাই হয়েছে গোপনে গোপনে। নিঃসাড়ে। সন্ধে বেলা যখন একের পর এক নিমন্ত্রিতরা আসা শুরু করল, মানবেন্দ্র-নির্মলা তো রীতিমতো স্তম্ভিত। তারপর ইয়া বড়ো কেক কাটা হল, এলাহি খাওয়াদাওয়া, গান-বাজনা, হইহুল্লোড়। ঝুমুরের তো শখ চেগেছিল মাকে আজ কনের সাজে সাজাবে, আর বাবাকে নতুন বর। টোপর, মুকুট, চন্দন, মালা, সব হাজির। তা বয়স যতই হোক, নির্মলা-মানবেন্দ্রর তো ভীমরতি ধরেনি, যে লোক হাসাতে ক্লাউন সাজবেন! তাও সদ্যকেনা ধুতি পাঞ্জাবি পরতেই হয়েছে মানবেন্দ্রকে, নির্মলাকে নতুন লালপাড় গরদের শাড়ি। কী যে ছেলেমানুষি করে কাটাল কয়েকটা ঘণ্টা!

নির্মলা অবশ্য ছেড়ে ফেলেছেন শাড়িখানা। বড্ড খসখস করছিল গায়ে। এখন আটপৌরে কাপড়ে অনেক বেশি স্বস্তি। ঝুমুরের দেওয়া গরদখানা ভাঁজ করতে করতে বললেন, মিছিমিছি এক কাঁড়ি টাকা নষ্ট!

—ওদের আমোদ ফুর্তি করার ইচ্ছে হয়েছে, করেছে। তবে এটা তো মানবে, বাবা-মার বিয়ের পঞ্চাশ বছর কোনো ফ্যালনা ইভেন্ট নয়।

—তোমারও খুব আহ্লাদ হয়েছে, তাই না?

নির্মলা মুচকি হাসলেন। শাড়িখানা সযত্নে আলমারিতে রেখে বললেন, ধড়াচূড়াটা এবার ছাড়ো। ...আর এই ফুল-টুলগুলো সরানোর কী হবে?

—থাক না যেমন আছে। শুধু পাপড়িগুলো হঠিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট। তবে...

—কী তবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—জাম্বো মালা দুটো কী করব?

—গলায় পরে বসে থাকো।

—আমাকে একা পরার জন্য তো দেয়নি। তোমারও একটা আছে। মানবেন্দ্র মাথা দোলালেন, এসো, দু-জনেই তাহলে পরে ফেলি। আর একবার মালাবদলটা হয়ে যাক।

—আদিখ্যেতার আমড়াআঁটি! ফেলতে যদি মায়া লাগে, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখো আর মাঝে মাঝে গন্ধ শোঁকো। অল্প দুলে দুলে লাগোয়া বাথরুমে চললেন নির্মলা। কী ভেবে দাঁড়িয়েছেন। ঘুরেই ফের নির্দেশ, আর ওই রজনীগন্ধার জালিও সরাও। মশারি টাঙাতে হবে।

—আচ্ছা বেরসিক তো! স্পেশাল একটা দিনে না হয় ফুলের মাঝেই শুলে।

—আমার ঘুমই আসবে না। সারাক্ষণ কানে মশা ভনভন করবে...

—কেন, ফুল ফোর্সে পাখা চালিয়ে রাখব...

—তাহলে আর দেখতে হবে না। এমনিতেই পিঠ-কোমর গেছে, এরপর সরাসরি ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগলে...

বাক্য অর্ধসমাপ্ত রেখে নির্মলা বাথরুমে। মানবেন্দ্র অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করলেন। প্রায় ভ্যাংচানোর মতো। কী যে বাতিকগ্রস্ত মহিলা! বারো মাস মশারিটি চাইই চাই। এই শ্রাবণের গুমোটে শরীর হাঁসফাঁস করছে, নেট গলে হাওয়াই ঢোকে না, তবু অন্যথা হওয়ার জো নেই। শুধু কি তাই? রাত্তিরে বার তিনেক উঠবে, প্রত্যেক বার মেপে এক চুমুক জল খাবে, সঙ্গেসঙ্গে এক পয়েন্ট করে কমিয়ে দেবে ফ্যান। পাশের মানুষটা যে ঘেমে নেয়ে গেল, মহারানির তাতে কোনো হেলদোলই নেই।

বিরক্তিটুকু গিলে লুঙ্গি গলিয়ে নিলেন মানবেন্দ্র। ধুতি-পাঞ্জাবি ভাঁজ-টাজ করা তাঁর ধাতে নেই, ওসব নির্মলার কাজ, কাপড়গুলো স্তূপ করে রাখলেন আলনায়। কোমরের কশি শক্ত করে বেঁধে নেমে পড়েছেন শয্যা সংস্কারে। চাদর-টাদর ঝেড়ে মশারির খুঁটগুলো একে একে লাগালেন ছত্রিতে। ব্যস, দায়িত্ব শেষ। গোঁজাগুঁজির কাজ এবার নির্মলার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলটায় বসলেন নির্মলা। ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন। মানবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কী খুঁজছ?

—ব্যথার বড়িগুলো। সারাসন্ধে নেচে বেড়িয়ে কোমর যেন খুলে পড়ছে। নির্মলা স্বামীকে ঈষৎ তাড়া লাগালেন, দেখো না একটু, চোখে ভালো ঠাহর হচ্ছে না।

পেন কিলারের সঙ্গে অম্লনিরোধকের পাতাও বার করেছেন মানবেন্দ্র। ছিঁড়ে নির্মলাকে দিয়ে নিজেও একখানা অ্যান্টাসিড নিলেন হাতে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বরাবরই তিনি সাবধানী, কিন্তু আজ একটু গুরুপাকই হয়ে গেছে। একখানা গোটা ফিশফ্রাই, বেশ খানিকটা বিরিয়ানি, চিকেন চাঁপ...। হজম-টজমে এখনও তেমন সমস্যা নেই তাঁর, তবু ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার! রাতদুপুরে বুকজ্বালা শুরু হওয়াও তো এক আতান্তর।

মিষ্টি ট্যাবলেটখানা চিবোতে চিবোতে মানবেন্দ্র বললেন, তোমার চোখের ছানিটা বোধ হয় এবার পেকেছে।

—কী জানি, হবেও-বা।

—এবার কাটিয়ে ফেলো।

—চলুক না যেমন চলছে। সাংঘাতিক অসুবিধে তো হয় না।

—তবু... অকারণ দেরি করে কী লাভ? চলো, এ সপ্তাহেই ডাক্তারের কাছে যাই।

—তোমার সঙ্গে যাব? খেপেছ? দশটা মিনিট বসতে হলেই বাবুর যা মুখ হাঁড়ি হয়। নির্মলা ওষুধের সঙ্গে আবার জল খেলেন এক ঢোক। উঠে গেছেন বিছানায়। সুড়ুৎ করে মশারির অন্দরে সেঁধিয়ে গিয়ে বললেন, আমার তো সেই ঝুমুরই ভরসা। সে বেচারা কসবা থেকে উজিয়ে গড়িয়া এসে মাকে নিয়ে গেলে তবেই না মা-র ডাক্তার দেখানো হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তা কেন, বাবলুও যেতে পারে। কিংবা শর্মিলা। অবশ্য যদি ছেলের বউয়ের সঙ্গে যেতে আপত্তি না-থাকে।

—আমি আপত্তি করার কে! তারা যা ব্যস্ত মানুষ... সময় সুযোগ পেলে তো।

—ওভাবে বলছ কেন? ওরা কি করে না? আমাদের জন্য যথেষ্ট ভাবে। আজকাল চারপাশে যা সব স্যাম্পল দেখছি, তাদের তুলনায় ওরা তো হিরের টুকরো। ...আগের বার তো শর্মিলার সঙ্গেই চোখ দেখাতে গিয়েছিলে। যাওনি?

—সে তো তার নিজেরও চশমার পাওয়ার বদলানোর ব্যাপার ছিল...

—হোক না। তবু নিয়ে গিয়েছিল তো। ...তারপর ধরো, আজও কত আনন্দ করে দিনটা সেলিব্রেট করল। ওদের গুণগুলো তোমার নজরে আসে না, শুধু দোষ খোঁজো।

নির্মলা চুপ হয়ে গেলেন, ঝুঁকে ঝুঁকে মশারি গুঁজছেন। মাথার দিকের জানলাটা খোলা, বাতাস আসছে থেকে থেকে। একটু যেন ভিজে ভিজে। বৃষ্টি নামল কি? নাহ, তেমন কোনো শব্দ তো নেই! অন্য দিন হলে জানলাটা ভেজিয়ে দিতে বলতেন নির্মলা, আজ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মাথা রেখেছেন বালিশে।

মানবেন্দ্রও এলেন বিছানায়। বড়ো আলো নিবিয়ে, রাতবাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে। একটুক্ষণ স্ত্রী-র পানে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললেন, রাগ হয়ে গেল?

ক্ষীণ সাড়া মিলল, নাহ।

—ওসব সিলি ব্যাপারগুলো ছাড়ো তো। দিনটা আজ কী সুন্দর কাটল বলো তো?

—তা কাটল।

—এত মিইয়ে মিইয়ে কথা বলছ কেন? তুমি কি দিনটাকে এনজয় করনি? এত হইচই, বাড়িটা কেমন জমজমাট ছিল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমি কি বলেছি খারাপ লেগেছে?

—তাহলে একটু খোলা মনে কথা বলো না। মানবেন্দ্রর গলায় পলকা হাসি বেজে উঠল, আজ কত উপহার পেলে ভাবো। রুমির দেওয়া লাভবার্ডটা তো মার্ভেলাস। ওটা কিন্তু আমাদের ঘরেই রাখতে হবে।

—রেখো। নির্মলা যেন খানিক সমে ফিরেছেন। ঠাট্টার সুরে বললেন, দিনরাত ওই পাখি জোড়ার দিকে তাকিয়ে থেকো।

মানবেন্দ্রকে বুঝি খানিক পলকের জন্য উদাস দেখাল। আনমনে বললেন, আজ সন্ধে থেকে একটা কথা খুব মনে হচ্ছে, বুঝলে।

—কী?

—এ-রকম একটা ফাংশন বোধ হয় জরুরি ছিল।

—কেন?

—ছিয়াত্তর বছর বয়স হল, কবে আছি, কবে নেই... আমাদের উপলক্ষ করে আর কি সবাই এভাবে একত্রে জড়ো হতে পারবে?

—অদ্ভুত কথা বলছ তো! আমরা কি খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে গেছি? তুমি এখনও পুরোদস্তুর ফিট। সেজেগুজে সকাল-বিকেল হাঁটতে বেরোচ্ছ, নাতির সঙ্গে সমানে সমানে দাবা খেলছ... এখনও সুগার ধরেনি, প্রেশার নেই...

—জরা তো এসেছে। টের তো পাই। হয়তো নেক্সট অ্যানিভার্সারির আগেই টেঁসে গেলাম।

—ও কী অলুক্ষুণে কথা! তুমি মরতে যাবে কোন দুঃখে? যদি যেতে হয়, তো অমি...। দেহ নড়ে না, দিন দিন অথর্ব হয়ে পড়ছি, আধিব্যাধি লেগেই থাকছে...

—মেয়েদের কইমাছের জান। তারা সব কিছু নিয়েও টিকে থাকে। বেটাছেলেরাই বরং ফুস করে উবে যায়। দেখবে হঠাৎ একদিন হার্টে মোক্ষম একটা ঘা, আর পাঁচ মিনিটে ফিনিশ। অন্তত তোমাদের বেশি ভোগাব না, এটুকু কথা দিতে পারি।

—আহ, থামবে? আজ কি এসব আলোচনা না-করলেই নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আরে বাবা, এই বয়সের এইটাই তো টপিক। সামনে আর আছেটা কী বলো? হয় জড়ভরত হয়ে টিকে থাকা, নয়তো মৃত্যু। বলেই আবার রঙ্গ জুড়েছেন মানবেন্দ্র, অবশ্য পেছন ফিরেও তাকাতে পারি। পঞ্চাশটা বছর কীভাবে কাটল, তার একটা হিসেব-নিকেশ তো করাই যায়।

—রাতদুপুরে তুমি এখন ব্যালেন্সশিট কষবে নাকি?

—ক্ষতি কী! জমার অঙ্ক তো আমাদের নেহাত কম নয়। আহামরি না-হলেও একখানা বাড়ি করেছি, ছেলে-মেয়ে দু-জনেই মোটামুটি মানুষ হয়েছে...। বাবলু তো এখনই চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কোম্পানিতে আরও কত উঁচুতে উঠবে তার কোনো ঠিক নেই। জামাইও আমরা মন্দ পাইনি। ঝুমুর আর স্মরজিৎ চুটিয়ে সংসারও করছে, ব্যাঙ্কের চাকরিও চালাচ্ছে। শর্মিলার ওপর তোমার যতই গ্রাজ থাক, পুত্রবধূ যে যথেষ্ট গুণবতী, এ তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। কলেজে পড়াচ্ছে, খেটেখুটে পি. এইচ. ডি.টাও করে ফেলল...। আমাদের নাতি-নাতনিরাও যথেষ্ট ব্রাইট। বুবলুর যা মেরিট, হয়তো আই.আই.টি.-তে চান্স পেয়ে যাবে। ...এ সবই তো প্লাস, নয় কি?

—জীবনের হিসেব কি অত সরল? নির্মলার গলা যেন সামান্য ভার ভার শোনাল, না-পাওয়ার ভাঁড়ারটাও তো নেহাত কম নয়।

—কী পাওনি?

—বলব? শুনতে ভালো লাগবে? নির্মলার চোখ মশারির চালে, যেমন ধরো, বি.এ. ফাইনালটা দিয়েই আমার বিয়ে হয়ে গেল। তোমরা দেখেছ, রেজাল্ট নেহাত মন্দ ছিল না। খুব ইচ্ছে ছিল এম.এ. পড়ব, পারলে আরও অনেক দূর...। কিছু মনে কোরো না, আমিও হয়তো শর্মিলার মতো কলেজে পড়াতে পারতাম। আমি জানি, আমার সেই যোগ্যতা ছিল।

—আমি তো তোমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বলেছিলাম। মানবেন্দ্রের গলা সামান্য উঠে গেল, তুমিই তো আর...

—ভাবের ঘরে চুরি কোরো না মশাই। রেজাল্ট যখন বেরোল, তখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো পেটে ঝুমুর এসে গেছে। তারপর তো তোমার বাবা, মা, তুমিও... এমন করে আমায় সংসারে গেঁথে ফেললে।

মানবেন্দ্র আলগা ভাবে ছুঁলেন নির্মলাকে। ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন, এখনও সেই আপশোস বুকে পুষে রেখেছ?

—উঁহু, আপশোস নয়। দুঃখ। ম্লান হাসলেন নির্মলা, এটা কি তুমি খরচের খাতায় রাখবে?

মানবেন্দ্রর স্বর ফুটছিল না। সবজেটে আবছায়া মাখা ঘর যেন তাঁকেও বিষণ্ণ করে দিচ্ছিল। বেশ খানিকক্ষণ পর বললেন, ও-রকম অতৃপ্তি কি আমারও নেই?

—কী আছে? সবই তো তোমার মর্জিমাফিক হয়েছে।

—ওটা মনে হয়। স্মরণ করে দেখো, বিয়ের সময়ও আমি চুটিয়ে ক্রিকেট খেলতাম। রঞ্জি ট্রায়ালে ডাকও পেয়েছিলাম। কিন্তু এই সংসার তো...। বিয়ে-থা করেছি, খেলা খেলা করে মাথা খারাপ করলে চলবে কেন? তাই চাকরিটাকেই মোক্ষম করে আস্তে আস্তে মাঠ থেকে সরে এলাম। তখন তো ক্রিকেটে এত পয়সাকড়ি ছিল না, যে মরিয়া হয়ে ওটাকেই আঁকড়ে থাকব। ব্যস, স্বপ্নটাও আস্তে আস্তে মরে গেল।

বাইরে সত্যি বৃষ্টি নেমেছে এবার। দমকা একটা হাওয়ার ঝাপটা এল ঘরে। মানবেন্দ্র ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলেন জানলা। নির্মলা বলার আগেই পাখাটা কমিয়ে দিলেন দু-ধাপ। গলা ঝেড়ে বললেন, এই ঠিক আছে তো? না আরও কমাব?

নির্মলাও বসেছেন খাটে। বললেন, না না, এতেই চলবে।

—দেখো, মনে ক্ষোভ পুষে রেখো না। মানবেন্দ্রর স্বর ফের তরল, বিয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে কিন্তু এই নিয়ে আর কমপ্লেন করার চান্স পাবে না।

—সে কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়? নির্মলা হাসছেন, হয়তো ভূশণ্ডির মাঠে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমার তখন শুনতে ভারি দায় পড়েছে। কোন পেতনির সঙ্গে তখন কোথায় লটকে আছি...।

—ফাজলামি রাখো। জলটা দাও।

ঘটিটা বাড়িয়ে দিলেন মানবেন্দ্র। জলপান পর্ব শেষ হতে পাত্রটি রেখেছেন স্বস্থানে। গলায় একটা ছদ্ম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, একটা কথা বলো তো? এই এক গণ্ডূষ জল খেয়ে তোমার কি তেষ্টা মেটে?

—কতটুকু জলে যে মেয়েরা তৃষ্ণা মেটাতে পারে, তা যদি তোমরা বুঝতে!

—এ তো কোটেশনের মতো ডায়ালগ গো! বানালে? নাকি মুখস্থ ছিল?

জবাব না-দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছেন নির্মলা। মানবেন্দ্রও বাথরুম ঘুরে বিছানায়। শুতে শুতে আচমকাই বললেন, সবাই তো কিছু দিল... আমারই তোমাকে কিছু দেওয়া হল না।

—এই বয়সে আর কী দেবে? আংটি? নোলক? বিছেহার?

—তা নয়। তবু যা হোক একটা কিছু...। মনে আছে, প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে কী দিয়েছিলাম?

—শাড়ি। কাঞ্জিভরম। পিঁজে গেছে, কিন্তু এখনও রেখে দিয়েছি। আর সেকেন্ড বছর এনেছিলে ঘড়ি। সোনালি ব্যান্ড। আর তৃতীয় বছর বিয়ের দিনটাই ভুলে গিয়েছিলে।

—এত মনে আছে?

—ছিল না। মনে পড়ে যাচ্ছে। নির্মলা যেন অন্ধকারে হাসলেন সামান্য। গলা নামিয়ে বললেন, তুমি আরও অনেক বার বিয়ের তারিখটা ভুলে গেছ।

মানবেন্দ্র বুঝি একটু লজ্জা পেয়েছেন। বললেন, বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে কখনো ভুলিনি।

—জানি তো। ইচ্ছে করে তুমি কোনো ভুলই করোনি।

কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা ধাক্কা আছে। মানবেন্দ্র ঈষৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেঁপে গেলেন যেন। বাইরের বৃষ্টির তেজ বেড়েছে। কান পেতে ঝমঝম শব্দটা শুনছিলেন মানবেন্দ্র। ওই শব্দই বুঝি কোনো এক গোপন তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত হানল। পাশে শুয়ে থাকা পঞ্চাশ বছরের সঙ্গিনীর নিঃশর্ত বিশ্বাস যেন বিদ্রূপের মতো বিঁধছে সর্বাঙ্গে।

হঠাৎ বিড়বিড় করে মানবেন্দ্র বলে উঠলেন, না নির্মলা, জীবনে ইচ্ছাকৃত ভুলও কিছু থাকে।

নির্মলা কৌতূহলও দেখালেন না, প্রশ্নও করলেন না কোনো। এতেই বুঝি চাপটা বেড়ে গেল আরও। ফ্যাসফেসে গলায় মানবেন্দ্র বললেন, আমার একটা ভুলের কথা... ভুল কেন বলব, অন্যায়... তোমাকে বলে উঠতে পারিনি। তোমার মনে আছে, আমার এক বন্ধু... অলকেশ... মোটরবাইক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল? ঝুমুর তখন বছর দশেকের, বাবলু আরও ছোটো।... অলকেশের ফ্যামেলিটা প্রায় ভেসে যাচ্ছিল। একটা সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে সুপ্রিয়ার তখন কী যে নাচার দশা! ওদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আমি যেন ক্রমে ক্রমে কেমন জড়িয়ে গেলাম। সুপ্রিয়া আমাকে নেশার মতো টানত। সম্পর্কটা খুব খারাপ দিকে গড়াচ্ছিল। মানে আমি একসময়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম, তোমাদের ছেড়ে সুপ্রিয়াকে নিয়েই একটা নতুন সংসার গড়ব। পেরে উঠিনি অবশ্য। সুপ্রিয়াও পিছিয়ে গেল, আমিও যেন তেমন সাহস পাচ্ছিলাম না...। ছেলে, মেয়ে, তুমি, সব কিছু মিলিয়ে একটা পিছুটান...। একসময়ে প্রায় জোর করে নিজেকে সরিয়ে আনলাম। খুব খারাপ লাগত তখন। সুপ্রিয়া অনেক দিন ধরে আমার মন জুড়ে ছিল। এখন অবশ্য সুপ্রিয়া কোথায় আছে, জানি না। বেঁচে আছে কি না তাও না।

কথাগুলো একদমে বলে ফেলে মানবেন্দ্র অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিলেন। আধো অন্ধকারে দেখবার চেষ্টা করেছেন নির্মলাকে। আজ একাত্তর বছর বয়সে পৌঁছে, স্বামীর এই স্বীকারোক্তিতে, নির্মলার হয়তো কিছুই যায় আসে না। তবু তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে রীতিমতো শঙ্কা অনুভব করছিলেন মানবেন্দ্র। নির্মলা কি রেগে যাবেন? ঝেঁঝে উঠবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেঁদে ফেলাও অসম্ভব নয়। নাকি স্রেফ হেসে উড়িয়ে দেবেন আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর আগের এক নিষিদ্ধ প্রণয়কে?

আশ্চর্য, নির্মলা অদ্ভুত রকমের নিরুত্তাপ। শান্ত গলায় বললেন, হঠাৎ আজ কথাটা বলছ যে?

—মনে হল মরার অগে আমার লুকিয়ে রাখা কথাটা...

—লুকোনো তো নেই। আমি তো আগাগোড়াই জানি। নির্মলার স্বর একেবারে সহজ, তোমার বন্ধু মলয় আমায় সব খবর দিয়েছিল। বার বার সাবধান করত, বউদি, আপনি কিন্তু কড়া হোন। যেমন ভাবে পারেন আটকান। মানব নিজেও ফেঁসেছে, আপনাদেরও সর্বনাশ হল বলে।

মানবেন্দ্র স্তম্ভিত। স্বরযন্ত্র যেন অকেজো সহসা। কোনোক্রমে বললেন, তুমি আমায় আগে বলনি তো?

—কী বলব? ঝগড়া করব তোমার সঙ্গে? নাকি দয়া চাইব? এর কোনোটাতেই কি সংসার টিকত?

—যদি আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যেতাম? কী করতে তাহলে?

—জানি না। ভাবিনি। জীবন তো নদীর মতো। বয়ে চলেছে। ধাক্কা খেয়ে হয়তো কোনো একটা বাঁক নিত। আবার চলত। নির্মলা পাশ ফিরলেন। মানবেন্দ্রর গায়ে আলগা হাত রেখে বললেন, যাক গে, এবার চোখ বোজো। আজ অনেক ধকল গেছে, এর পর জাগলে শরীর খারাপ হবে।

নিজেকে ভীষণ ছোটো লাগছিল মানবেন্দ্রর। আবার গর্বও হচ্ছিল, নির্মলার জন্যে। এত স্বচ্ছ ভাবেও দেখা যায় জীবনটাকে?

বাইরে বৃষ্টি বাড়ছে, কমছে। হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটা আছড়ে পড়ছে বন্ধ জানলায়। অন্দরে পাখা ঘুরে চলেছে একটানা। মন্থর লয়ে। ঘুমোচ্ছেন মানবেন্দ্র, ঘুমোচ্ছেন নির্মলা। পঞ্চাশ বছরের পুরোনো দম্পতি। ফুলের সুবাসে ভরে উঠেছে ঘর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপক্রমণিকা

ছুটির সকালে বাজার থেকে ফিরে সবে খবরের কাগজটি খুলে বসেছি, অমনি পাশের বাড়ির বিপিনবাবু এসে হাজির। ধপাস করে সোফায় বসে বললেন, সুখে আছেন মশাই। এদিকে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

বিপিনবিহারী বটব্যাল একজন নিপাট ভালোমানুষ। পাড়ার কারুর সাতে পাঁচে থাকেন না, ভুলেও কখনো কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেন না, বিনা প্রতিবাদে পাড়ার পুজোয় চাঁদা দিয়ে দেন, লোকের উপকার ছাড়া কখনো অপকার করেননি। দোষের মধ্যে দোষ, একটু বেশি কথা বলেন, এই যা। সেই মানুষের আবার কী বিপদ হল? ঘাবড়ে যাওয়া মুখে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী হয়েছে?

—আর বলবেন না, যা ঝকমারিতে পড়েছি! বিপিনবাবু পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন, কাল ছিল আমার পেনশন তোলার দিন। সকাল থেকে মেজাজটা ভারি ফুরফুরে হয়ে ছিল, ঘুম থেকে উঠেই ব্যাগ হাতে সোজা চলে গেলাম বাজার। আমাদের এই বাজারটার আজকাল কী হাল জানেনেই তো, কাদায় কাদায় ছয়লাপ হয়ে থাকে। তার ওপর পরশু রাতে বৃষ্টি হয়েছিল... পিছলে পড়ে হাত পা ভাঙার দশা।

—কাদায় পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? চোট পেয়েছেন?

—না না, পড়ব কেন! সামলে সুমলে ঢুকেছি তো মাছের বাজারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি, ইয়া বড়ো বড়ো ইলিশমাছ এসেছে। কী তার রং, কী তার চেহারা! গায়ে যেন রুপো ঝিলিক কাটছে! জিজ্ঞেস করলাম, কোথাকার মাছ ভাই? বলল, কোলাঘাটের। এমন মাছ আর এ-বছরে আসেনি বাবু, নিয়ে যান, ঠকবেন না। ব্যস, অমনি লোভে পড়ে কিনে ফেললাম একখানা সওয়া কেজির ইলিশ।

—তা সেই মাছ বুঝি পচা বেরোল? নাকি ওজন কম?

—দুর মশাই, বিপিনবিহারীকে মাছে ঠকাবে? আমার হল গিয়ে জহুরির চোখ। কানকো দেখে বুঝতে পারি সে মাছ কখন জালে পড়েছে। হাতে তুলে বলতে পারি ক মিলিগ্রাম কম বেশি।

—তাহলে? বউদি কি ইলিশমাছ পছন্দ করেন না?

—মোটেই না। তোলা তোলা করে খায়। কাঁটচচ্চড়ি করার জন্য পুঁইশাক এনেছিলাম, সঙ্গে কুমড়ো ঝিঙে বেগুন, বাজার টুঁড়ে টুঁড়ে অসময়ের মুলো...

—বাহ্, এ তো ভালো ব্যাপার। এর মধ্যে ঝকমারিটা কী হল? রান্নাটা কি তবে জুতের হয়নি?

—জুত কী বলছেন? অমৃতর মতো রেঁধেছিল আমার গিন্নি। অমন উত্তম ইলিশ ভাপা কতকাল যে খাইনি। লোভে পড়ে একটার জায়গায় তিন পিস্।

—তারপর? খেয়ে বুক আইঢাই? অম্বল? বদহজম?

—ওসব মিনমিনে রোগ আমার নেই মশাই। এখনও লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারি।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি, খেয়েদেয়ে তো বেরোলাম। ছাতাটি বগলে নিয়ে। যেই না বাসে উঠেছি ওমনি...

—পকেটমার ছিনতাইবাজের পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি?

—না। ছোটোবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। হরিসাধন। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম আমরা। হরিসাধনটা ছিল বেজায় বজ্জাত। স্কুলের পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নারকোল গাছ ছিল, টিফিনের সময়ে গাছটায় তরতর উঠে গিয়ে ডাব পেড়ে আনত। যাদের গাছ, তাদের সঙ্গে এই নিয়ে যে কত বার ঝামেলা হয়েছে। একবার তো ভদ্রলোক হেডস্যারের কাছে কমপ্লেন ঠুকে দিল। আমাদের হেডস্যার ছিলেন বেজায় কড়া, গুনে গুনে পঁচিশ বেত লাগিয়েছিলেন হরিসাধনের তালুতে। বেচারার হাতের চেটো ফুলে ঢোল। বাড়িতেও বলতে পারছে না, মার খাওয়ার কারণ শুনলে তারাও ছেলেকে উত্তমমধ্যম দেবে...। বাজারে একটা বরফের দোকান ছিল, সেখান থেকে বরফ এনে রুমালে বেঁধে হাতে পুলটিস লাগানো হল। তাতেও হরিসাধনের দৌরাত্ম্য কমেনি। একদিন নিজেদের বাড়িরই আমগাছ থেকে আম চুরি করতে গিয়ে...

মেন লাইন ছেড়ে কর্ড লাইনে চলে গেছেন বিপিনবিহারী। গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, তা সে হরিসাধনবাবুই বুঝি আপনাকে ঝকমারিতে ফেলেছেন?

—ছি ছি। এক হাত জিভ কাটলেন বিপিনবিহারী, পুরোনো বন্ধু কখনো বিপদে ফেলতে পারে? চল্লিশ বছর পর দেখা হল, কত মনের প্রাণের আড্ডা হল দুজনের। হরিসাধন চাকরি করত পুলিশে, ইনস্পেকটর হয়ে রিটায়ার করেছিল। আশ্চর্য কী জানেন? আমি যে ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন তুলি, ওরও পেনশন সেই ব্যাঙ্কেই। অথচ আমাদের দুজনের কোনোদিন দেখা হয়নি। একই রুটের বাসে যাই, সেখানেও না। এই নিয়ে আমরা দুজন খুব হাসাহাসি করলাম।

—তা এর মধ্যে ঝকমারিটা হল কোথায়? ব্যাঙ্কে বুঝি পেনশনারদের বড়ো লাইন পড়েছিল? গরমে দাঁড়াতে হয়েছে অনেকক্ষণ?

—নাহ্, কপাল গুণে কাউন্টার কাল ফাঁকাই ছিল। দুজনেই টাকা পকেটস্থ করে গিয়ে বসলাম কার্জন পার্কে। বোঝেনই তো, এতকাল পরে দেখা, আমাদের কথা আর ফুরোয়ই না। হরিসাধন ওর পুলিশজীবনের রোমহর্ষক কাহিনি শোনাচ্ছে, আমিও আমার সরকারি অফিসের গল্প শোনাতে মশগুল। গল্প করতে করতে তিনটে বেজে গেল। হরিসাধন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, চল, অনেকদিন ডেকার্স লেনের ঘুগনি খাইনি, আজ জম্পেশ করে ঘুগনি খাই। তখনও আমার পেট রীতিমতো ভরা, তবু জিভটা কেমন শুলিয়ে উঠল। ডেকার্স লেনের ঘুগনি জানেন তো? দারুণ ফেমাস। পাতলাও নয়, ঘনও নয়। মটর শক্তও নয়, গলা গলাও নয়। ঝাল মশলাও একেবারে মাপা। এক প্লেট খেয়ে থামতে পারলাম না, নিয়ে ফেললাম আরেক প্লেট।

—বুঝেছি। সেই ঘুগনি খেয়েই পেট গেছে। তাই নিয়েই ভুগছেন সকাল থেকে।

—ধুস। বললাম না আপনাকে, আমার কক্ষনো পেটের অসুখ হয় না। এই বয়সেও আমার স্টমাক যথেষ্ট শক্তপোক্ত।... তা দু-প্লেট করে ঘুগনি সাঁটিয়ে আমি আর হরিসাধন তো উঠে পড়লাম। ও গেল মেয়ের বাড়ি শ্যামবাজার, আর আমি উঠলাম ফিরতি বাসে। তখন অফিস সবে ছুটি হব হব করছে, বাসে রীতিমতো ভিড়। কোনোরকমে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছি, পকেটে পেনশানের টাকা...

—পিকপকেট হয়ে গেল নাকি? নড়েচড়ে বসলাম,— পুরো টাকাই গেল?

—মাথা খারাপ? আমার পকেট মারবে? সারাক্ষণ পকেটে হাত চেপে দাঁড়িয়ে, পকেটমারের সাধ্য কি আঙুল গলায়! তবে যাই বলুন, এক বগলে ছাতা নিয়ে অন্য হাতে পকেট সামলানো মুখের কথা নয়। মনে মনে তখন খুব রাগ হচ্ছিল, কেন ছাতা নিয়ে বেরোলাম!

—সেই অকাজের ছাতাটাই বুঝি গেল শেষে?

—ঠিক উলটো। ছাতাটাই বরং কাজে লেগে গেল। বাস থেকে নামার পরে পরেই তো বৃষ্টি এল কাল। হল মাত্র দশ মিনিট, কিন্তু তার কী তোড় ছিল বলুন? পেট আমার পোক্ত বটে, তবে লাংস দুটো তো ঝরঝরে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়লেই শুরু হয়ে যায় সর্দিকাশি, দেখ না দেখ শয্যা নিতে হয়। ওই ছাতার কল্যাণেই কাল বেঁচে গেলাম বলা যায়। টাকাটাও ভিজল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কী কাণ্ড, এ তো দেখি সবই ভালো ঘটনা! আপনার সর্বনাশটা হল কখন?

—বলছি মশাই। বাড়ি ফিরে দেখি এক বিচ্ছিরি অবস্থা। গিন্নি অন্ধকারে বসে। মুখ কালো করে।

—কেন? কেন?

—ফিউজ উড়ে গেছিল। মেইন মিটার থেকে। ভাবুন, এই গরমে যদি কারেন্ট না থাকে...। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের তো জানেন, ভগবানকে পাওয়া সহজ, তাদের দর্শন পাওয়া যায় না...

—ও। তার মানে সারারাত ঘুমোতে পারেননি? গরমে সেদ্ধ হয়েছেন?

—হতাম। যদি নিজে ইলেকট্রিকের কাজ না-জানতাম। ওইসব টুকটাক কাজের জন্য আমি মিস্ত্রির পরোয়া করি না মশাই। এই তো সেদিন আমার জলের কলটা খারাপ হয়ে গেল, আমি থোড়াই কলের মিস্ত্রি ডেকেছি! সোজা চলে গেলাম ওয়েলিংটন। কল কিনলাম, পাইপ কিনলাম...। জানেন তো, ওখানে পাইপ কল সব বেশ সস্তা। বিশেষ করে চাঁদনি মার্কেটের দিকটায়। এখানে যদি দাম হয় এক-শো টাকা, ওখানে তার দাম হবে ষাট। মিস্ত্রিও কলে হাত দিলে না-হোক নিত পঞ্চাশ ষাট টাকা। তাহলে কতগুলো টাকা আমার বাঁচে বলুন? তবে কাল নিজে ফিউজ সারাতে গিয়ে...

—আহাহা, কারেন্ট খেয়েছেন তো?

—উঁহু। তার খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর মনে পড়ল, বাথরুমের লফটে পুরোনো তার প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে রাখা আছে। ওই অন্ধকারের মধ্যেই অ্যালুমিনিয়ামের সিঁড়িতে চড়ে হাতড়ে হাতড়ে তার বের করলাম। তারপর তো ফিউজ লাগানো দু-মিনিটের কাজ। তবে হ্যাঁ, একটু মেপে-জুপে লাগাতে হয়। তার বেশি মোটা হলে মেইন উড়ে যাবে, বেশি পাতলা হলে নিজেই ঘন ঘন জ্বলবে। অবশ্য আমার ভালো প্র্যাকটিস আছে তো, আমার হাতে তেমন বিপদের আশঙ্কা কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যে দেখি রুশী সৈনিক! রোদে পোড়ে না, জলে ভেজে না, সমস্ত বিপদ টপকে টপকে চলে যায়! এমন মানুষের কী সর্বনাশই-বা আর ঘটতে পারে? নতুন করে প্রশ্ন করতেও সাহস হচ্ছে না, কোন কথা থেকে বিপিনবাবু কোথায় চলে যাবেন ঠাহর করা দায়।

ভয়ে ভয়ে বললাম— সর্বনাশের কথা পরে হবে। একটু চা খাবেন তো? সঙ্গেসঙ্গে বিপিনবিহারীর প্রৌঢ় মুখখানি উদ্ভাসিত, অবশ্যই। অবশ্যই। ওই সর্বনাশের কথাই তো আপনাকে বলতে এসেছি।

—মানে?

—কাল রাত্তিরে ছেলে এসেছিল। মাকে দু-দিনের জন্য নিয়ে গেল নিজের ফ্ল্যাটে। নাতি নাতনির সঙ্গে মৌজ করবেন বলে আপনার বউদিও ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন। রান্নার লোক আসবে সেই বেলা দশটায়। এতক্ষণ চা না-খেয়ে থাকি কী করে বলুন তো? এটা কি একটা সর্বনাশ নয়? নাকি একে ঝকমারি বলবেন না?

মুখে জবাব এল না। ঘাড় নাড়লাম ঢক করে।

বিপিনবাবুর গলায় অনুযোগ— তখন থেকে আপনাকে তো এই কথাটাই বলতে চাইছি। আপনিই উলটোপালটা গপ্পো জুড়ে আমার সব গুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

বটেই তো। বটেই তো। এবারও আমার ঘাড় নড়ছে। সিধেসাধা ভাবেই মহান সর্বনাশের গল্প ফেঁদেছিলেন বটে বিপিনবাবু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের মধ্যে মন

বেশ তো তরতরিয়ে চলছিল জীবনটা। ঠিকঠাক একটা চাকরি, নিজের পছন্দের বউ, চুটিয়ে সংসার, ফ্ল্যাট কেনা, ছেলেকে মনের মতো মানুষ করা, ছেলের বিয়ে, চাকরি থেকে অবসর, সবকটা ধাপই তো মৃণাল মসৃণভাবে পেরিয়েছে! চৌষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে আচমকা এ কী ছন্দপতন?

নার্সিং হোমের লাউঞ্জে বসে কথাটা ভাবছিল মৃণাল। পরশু সকালেও তো দীপা দিব্যি সুস্থ-স্বাভাবিক। রান্নাবান্নার তদারকি করল, ছেলে-ছেলের বউ অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর, 'চাঁদ কহে চামেলি গো' মেগা-সিরিয়ালটার রিপিট টেলিকাস্ট দেখল, বার বার চায়ের ফরমাশ নিয়ে মৃণালের সঙ্গে রুটিনমাফিক ঝগড়াও করল একপ্রস্থ... মাত্র এক-দেড় ঘণ্টা পরে, সেই দীপারই কিনা সেরিব্রাল অ্যাটাক! এবং দু-দুটো দিন আইসিইউ-তে থেকেও উন্নতির তেমন লক্ষণ নেই!

দীপা কি শেষমেশ চলেই যাবে? মৃণালকে ছেড়ে? চৌষট্টি বছর আজকাল এমন কিছু বয়স নয়, আরও কতদিন মৃণাল টিকে থাকবে কে জানে! বাকি জীবনটা তার কাটবে কী করে? একা একা? অভ্যস্ত ছকের বাইরে?

ভাবনাটায় একটা বিশ্রী অস্থিরতা আছে। একধরনের অসহায়তাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় স্বগতোক্তির মতো মৃণাল বলে উঠল— দীপা এটা ঠিক করল না।

মৃণালের পাশে নীপা। জামাইবাবুর অস্ফুট বাক্যটি বুঝি কানে গিয়েছে তার। মৃণালের পিঠে আলগা হাত রেখে বলল, এত মন খারাপ করছেন কেন? দেখুন না, দিদি ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

—অবশ্যই। প্রাথমিক ধাক্কাটা তো সামলে গিয়েছে, না কি! গিন্নির সান্ত্বনার সুরটা ধরে নিয়েছে ভাস্কর। গলা সামান্য তুলে বলল, হাত-পায়ের সাড় তো ফিরেছে।

—কী জানি কী হবে! আর কি দীপা আগের মতো...

—অলক্ষুণে কথা বলবেন না তো। থিঙ্ক পজিটিভ... ডাক্তার কাল কী বলল, অ্যাঁ? চোটটা তেমন সাংঘাতিক নয়। ফারদার অ্যাটাক না হলে রিকভারির সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। অন্তত ট্রিটমেন্টের সুযোগ তো পাওয়া গেল! আজকাল কত ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে...

কথোপকথনের মাঝেই তুলির আবির্ভাব। শাশুড়িকে দেখতে আইসিইউ-তে গিয়েছিল, নেমেছে। ভিজিটিং কার্ডখানা মৃণালকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখে আসুন বাবা। মা আজ সত্যিই অনেক বেটার।

মৃণাল সামান্য উৎসাহিত মুখে বলল— চোখ খুলেছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখছেন তো তাকিয়ে তাকিয়ে।

—কথা বলল?

—নাহ্। এখনও বোধ হয় সেভাবে চিনতে পারছেন না। বলেই কথাটা সামলে নিল তুলি— মনে হয় আরও দু-একদিন সময় লাগবে।

—ও।

—তবে মা-র চোখের মণি দুটো কিন্তু বেশ নড়াচড়া করছে। যেন মা কাউকে খুঁজছেন।

—নিশ্চয় মৃণালদাকে। নীপা হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে— যান মৃণালদা, চটপট যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় এ-রকম হয়। সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে না-দেখলে পেশেন্টের নরমাল সেন্স ফিরতে চায় না।

মৃণাল গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। এগোতে গিয়েও কী ভেবে থমকেছে। ঘুরে তুলিকে জিজ্ঞেস করল— বাবান গিয়েছিল মা-র সামনে?

—মিনিট পাঁচেক ছিল। ওকেও নাকি সেভাবে রেকগনাইজ করেননি।

তুলি পলক থেমে বলল— বাবা, আমারও মনে হয়, মা আপনাকেই...

এই সংকটের মুহূর্তেও একটু যেন আত্মপ্রসাদ অনুভব করল মৃণাল। পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন, একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে লেপটে থাকা— তার একটা মূল্য তো আছেই। বুকে খানিকটা বাতাস ভরে মৃণাল লিফ্‌টে ঢুকল। একটা একটা করে তলা পেরোচ্ছে।

চারতলায়, চওড়া প্যাসেজের প্রান্তে, বিশেষ সেবা প্রকোষ্ঠ। কাচের দরজা ঠেলে অন্দরে পা রাখতেই, মৃণালের শরীর জুড়ে সেই অস্বস্তিকর শিহরন। কেমন একটা মৃত্যুর গন্ধ যেন ছড়িয়ে থাকে শীতল ঘরটায়। নাকি এ-গন্ধ জীবনের? প্রাণবায়ুর? প্রায় নিঃশব্দে চলাফেরা করছে সেবিকারা, দর্শনার্থীরা কথা বলছে অতি অনুচ্চ স্বরে। রোগীদের মাথার পাশে মনিটরের বিপ বিপ, হৃদ্‌যন্ত্রের গতিবিধি সূচিত হচ্ছে পর্দায়, অক্সিজেন, স্যালাইন— সব মিলেমিশে এ যেন এক ভয় ধরানো কোলাজ! অজান্তেই বুক কাঁপে।

ধুকপুকুনিটুকু সঙ্গে নিয়ে সাত নম্বর বেডের সামনে এল মৃণাল। অক্সিজেন আজ খোলা, শুধু ড্রিপ চলছে দীপার। এবং তুলি ঠিকই বলেছে। দীপার চোখ খোলা, ঘুরছে এদিক-ওদিক।

বিছানার রেলিংখানা ধরে মৃণাল অল্প গলা খাঁকারি দিল। দৃষ্টি ক্ষণেক স্থির হল কি দীপার? ঠোঁট দুটো নড়ছে না?

মৃণাল ঝুঁকল সামান্য। নীচু স্বরে বলল— কিছু বলবে?

আবার নয়নমণি আবর্তিত হচ্ছে। ফের ঠোঁট নড়ে উঠল।

মৃণাল আর একটু ঝুঁকল— হ্যাঁ, বলো। শুনছি।

—সুজয়... এসেছ...?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারেই জড়ানো গলা। মৃণাল ভুলভাল শুনছে না তো?

দীপার প্রায় কানের কাছে মুখটাকে নামাল মৃণাল। ফিসফিসিয়ে বলল— আমি গো, আমি। আমাকে বুঝতে পারছ না?

কোনো প্রতিক্রিয়া ফুটল না দীপার মুখমণ্ডলে। ফাঁকা দৃষ্টি একইভাবে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ফের অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল, সুজয়... তুমি...

মৃণাল যেন লক্ষ ভোল্টের শক খেল সহসা। তাকে নয়, তাকে নয়, আটত্রিশ বছর আগের সুজয়কে খুঁজছে দীপা! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না মৃণাল। এও কি সম্ভব? মনের কোনো চোরাকুঠুরিতে দীপা আজও সুজয়কে রেখে দিয়েছে? এত গভীরভাবে যে, স্বামী নয়, ছেলে নয়, চেতনায় ফেরার মুহূর্তে সে সুজয়কেই প্রথম খোঁজে?

ঠান্ডা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মৃণাল। উদ্‌বিগ্ন মেজাজ নিমেষে কষটে মেরে গিয়েছে। এ কেমন প্রহেলিকা? সেই কোন যুগে দল বেঁধে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গিয়েছিল বন্ধুরা। দীপক, সুজয়, রবিন, অরুণাভ...। তখনও মৃণাল চাকরি পায়নি, বন্ধুরাও কাঠবেকার। হাজারদুয়ারিতে আলাপ হয় দীপার সঙ্গে। কলেজ থেকে এক্সকারশনে গিয়েছিল দীপারা, ট্রেনে ফিরেছিল একসঙ্গে। শিয়ালদায় যখন নামল, মৃণাল আর সুজয় দুজনেই তখন দীপার প্রেমে হাবুডুবু। ত্রিভুজটা অবশ্য গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। সুজয়কে সেভাবে আমলই দেয়নি দীপা। দাগা খেয়ে সুজয় তো মৃণালদের বৃত্ত থেকেই সরে গেল। বিয়েতে সুজয়কে নেমন্তন্ন করেছিল মৃণাল, আসেনি সুজয়। তারপর থেকে তো আর যোগাযোগই নেই। পরে শুনেছিল কোনো এক থিয়েটারের অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছে। সেই বিয়েও নাকি টেকেনি। বছর তিনেকের মধ্যেই মেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে সুজয়ের বউ। তারও বেশ কয়েক বছর পর অরুণাভ খবর দিল, সুজয় নাকি শিলিগুড়িতে সেটল করেছে। কোনো এক নির্মাণসংস্থায় কাজ করে, আর সন্ধে হলেই বোতল খুলে বসে।

সেই সুজয় কোত্থেকে ভেসে এল দীপার স্মৃতিতে? গোপনে সম্পর্ক রেখেছিল কি? চিঠিপত্রে? কিংবা ফোনে...?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছি ছি, এসব কী উদ্ভট চিন্তা! মৃণাল কষে ধমকাল নিজেকে। যে দীপা সুজয়কে কখনোই পছন্দ করেনি, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে? তাও আবার মৃণালকে লুকিয়ে? এ কি হয়? হতে পারে? সবচেয়ে বড়ো কথা, ষাট ছুঁইছুঁই দীপা, এখন তো নিজের সংসারেই গলা অবধি ডুবে আছে। একটা সময় তো ছেলে ছাড়া জগৎই ছিল না। আর এখন, ছেলে-ছেলের বউ, সাংসারিক কূটকচালি, আত্মীয়-পরিজন, আর টিভি-সিনেমাতে বিভোর সর্বক্ষণ। মৃণালকেও তো ঘিরে রেখেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। সুজয়ের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মানুষ কোন ফাঁক দিয়ে দীপা মনে ঢুকবে?

তবু দীপা সুজয়কেই খুঁজল। কেন? কেন?

বিদঘুটে পোকাটা মাথায় নিয়ে নীচে নামল মৃণাল। লাউঞ্জে এখন অনেকেই হাজির। মৃণালের ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাগনে, তুলির বাবা-দাদা, বাবানের জনা দুয়েক বন্ধু। তুলি কী সব বলছে হাত-মুখ নেড়ে, বাকিরা শুনছে মন দিয়ে।

মৃণালকে দেখে বাবান এগিয়ে এল— কেমন দেখলে?

ফ্যাকাশে হেসে মৃণাল বলল— একইরকম তো...

—কেন, মা-র তো ভালোই সেন্স ফিরেছে!

—কই? চিনতে তো পারল না।

মোটা অ্যালবামটার পাতা ওলটাচ্ছিল মৃণাল। কত অজস্র ছবি। কিছু পুরোনো হয়ে প্রায় বিবর্ণ, তবে বেশির ভাগই উজ্জ্বলতা হারায়নি। হাজারদুয়ারিতে তোলা ছবিগুলোও বেশ টিকে আছে। দারুণ একটা পোজ মেরে বাচ্চেওয়ালি তোপের সামনে দাঁড়িয়ে দীপা, ঠোঁটে মুচকি হাসি। বিয়ের পর ফোটোটা দেখিয়ে দীপাকে খুব খেপিয়েছে মৃণাল। ছাঁদনাতলায় মালাবদলের পাশে শোভা পাচ্ছে কালিম্পংয়ের হানিমুন। বাবানের অন্নপ্রাশন, হাতেখড়ি, একটু একটু করে বেড়ে ওঠা, মৃণাল আর দীপা ক্রমে ক্রমে বুড়িয়ে যাওয়া, পুরী-নৈনিতাল-কন্যাকুমারী— সবই যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে দীপা। এককালে এই অ্যালবামবাতিক নিয়ে মৃণাল ঠাট্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বলত, নেই কাজ তো খই ভাজ! রিটায়ারমেন্টের পর অবশ্য দেখতে মন্দ লাগে না ছবিগুলো। যে-জীবনটা হইচই করে কেটে গেল, এ যেন তাকেই ছুঁয়েছেন অনুভবে।

আজ কিন্তু মৃণাল সেভাবে দেখছিল না। কী যেন খুঁজছে। এ পাতায়, সে পাতায়। কী যে খুঁজছে সঠিক জানে না, তবে দীপার ছবি এলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে চোখ। এই দীপার আড়ালে অন্য কোনো দীপাকে খোঁজে কি?

দরজায় তুলি। হাতে চায়ের কাপ। সবে নার্সিং হোম থেকে ফিরেছে, এখনও পরনে বাইরের পোশাক। কাপ-ডিশ সাইড-টেবিলে রেখে তুলি বলল— কী দেখছেন বাবা, এত মন দিয়ে?

অ্যালবামটা দ্রুত বন্ধ করল মৃণাল। যেন খোলা থাকলে তার গোপন চিন্তাটা ধরা পড়ে যাবে। জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল— এখন আবার চা কেন?

—আপনি তো এই সময় এক কাপ খান বাবা। তুলি বিছানার ধারটিতে বসল। স্বচ্ছ গলায় বলল— নীপামাসি আজ আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

—কী বলছিল?

—পরপর দু-দিন নার্সিং হোমে গেলেন না তো... শরীর-টরির খারাপ হল কি না...। খুব টেনশন করছিলেন মাসি।

—কেন?

—সারাদিন একা একা থাকেন... আমরা দু-জনেই বাইরে... কীভাবে কী চলছে, আপনার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না...। আমি অবশ্য বলেছি, সুলতা বেলাতেও এখন একবার করে আসছে। তরিতরকারি গরম করে আপনাকে খেতে দিয়ে যায়। শুধু বিকেলের চা-টাই যা...

—করে নিচ্ছি তো। পারছি।

—চা করা কী এমন কঠিন কাজ, তাই না?

—হুম। আস্তে আস্তে সবই শিখে যাব। শিখতে তো হবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলি হেসে ফেলল— না বাবা, এবার একটা রাতদিনের লোক রেখে নেব। খুঁজছি। মায়ের জন্য তো লাগবেই।

মা আগে ফিরুক। বলতে গিয়েও স্বর ফুটল না মৃণালের। কাপ তুলেছে হাতে। চায়ে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল— কবে তোমার শাশুড়িকে আইসিইউ থেকে বার করবে, কিছু শুনলে?

—আজ বোধ হয় ডাক্তার বলবে। আপনার ছেলে তো নার্সিং হোমে রয়ে গেল, ফিরলে জানা যাবে।

—এখন বাজল ক-টা?

—সাড়ে আটটা।... আপনি তো ঘড়ি ধরে খান, সাড়ে ন-টায় দিয়ে দেব?

—অত ধরাবাঁধা কিছু করতে হবে না। বাবান আগে আসুক তো।

চা শেষ। কাপ-ডিশ নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল তুলি, কী ভেবে দাঁড়িয়েছে। নরম গলায় বলল— একটা কথা বলব বাবা?

—কী?

—আপনার কিন্তু এভাবে বাড়িতে বসে থাকা ঠিক নয়। বিকেলে নার্সিং হোম গেলে লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, দু-চারটে কথা বললে মনটাও তো ভালো থাকে।

প্রশ্নটা যে উঠবেই জানত মৃণাল। তবু তুলির মুখে শুনে সামান্য অপ্রতিভ বোধ করল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল— তোমাদের তো বললাম, ওই আইসিইউ-তে ঢুকতে আমার একদম ভালো লাগে না।

—ওপরে উঠবেন না। নীচেই থাকবেন। তুলি আলতো হাসল। ঠোঁট টিপে বলল— তবে আপনাকে দেখলে মা কিন্তু খুব খুশি হবেন।

—বোঝা যাবে কী করে? পেশেন্টের হাসি দেখে?

—যাহ্, মা তো এখন কথাও বলছেন। বেশি নয় অবশ্য। দুটো-চারটে। তবে অনেক স্পষ্ট। আজই তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অফিস যাচ্ছ?

মৃণালের জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল দীপা তার খোঁজ করছিল কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁটে ঠিক এল না প্রশ্নটা। বাধো বাধো ঠেকছে। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল— আবার ব্রেন স্ক্যানের কথা শুনছিলাম যেন? কবে হচ্ছে?

—কাল। কিংবা পরশু। তবে দুশ্চিন্তার বোধ হয় আর কারণ নেই বাবা। ডক্টর রায় খুব কনফিডেন্ট, মা-র ক্রাইসিস নাকি কেটে গিয়েছে। হেমারেজের ফলে আর্টারিতে যে ব্লাডটা ক্লট করেছিল, ম্যানিক্ল ইঞ্জেকশনে সেটা প্রায় উধাও। নইলে মা-র প্যারালিটিক টেন্ডেন্সিটাও নাকি কমত না, নরমাল সেন্সেও ফিরতেন না এত তাড়াতাড়ি। এখন শুধু চাই ধৈর্য, আর ট্রিটমেন্টটা স্টেপ বাই স্টেপ চালিয়ে যাওয়া। তাহলেই দেখবেন মা...

বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছে তুলি। মৃণালের তো শুনে স্বস্তি পাওয়া উচিত। পুলকিত হওয়া উচিত। উল্লসিত হওয়া উচিত।

কিন্তু স্নায়ুগুলো কেন যেন উজ্জীবিত হচ্ছে না মৃণালের। কেন যে...!

দীপা সত্যি সত্যিই সামলে গেল ধাক্কাটা। দিন পনেরোর মধ্যেই। ডান হাতের জোর অবশ্য ফেরেনি পুরোপুরি, হাঁটছেও ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। তাও তাকে মোটামুটি সুস্থই বলা যায়। বাচনে জড়তা নেই, হাসছে, খাওয়াদাওয়া করছে প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মতো। বাড়ি ফেরার জন্য সে এখন রীতিমতো উতল।

মৃণালও ফের আসা-যাওয়া করছে নার্সিং হোমে। পাঁচজনের মনে অকারণ কৌতূহল জাগিয়ে কী লাভ! একান্ত ব্যক্তিগত জ্বালাটুকু থাক না একান্তে! গিয়ে নয় দীপার পাশে দাঁড়ালই দু-দণ্ড। ভিতরে যতই ধিকিধিকি আগুন জ্বলুক, ভালোমানুষ স্বামী সাজা, প্রথামাফিক বাঁধা লবজের দুটো-চারটে কুশল প্রশ্ন ছোড়া, কী-ই বা কঠিন!

আজ নার্সিং হোমে এসে মৃণাল দেখল, বাবান বেজায় উৎফুল্ল। ভাস্কর-নীপা, মৃণালের ভাই— সকলেরই চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ। আগামীকাল সকালে ছুটি হয়ে যাচ্ছে দীপার।

ভাস্কর মাথা দুলিয়ে বলল— ভালোই হল মৃণালদা। নার্সিং হোমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ফেলে রাখা মানে তো, অনর্থক টাকা খরচা। এখন তো চিকিৎসা বলতে একটাই। রেগুলার ফিজিয়োথেরাপি। ওটা তো বাড়িতেই চলতে পারে।

তমাল বলল— আমি বাবানকে ফিজিয়োথেরাপিস্টের সঙ্গে কনট্যাক্ট করিয়ে দিয়েছি। ভদ্রলোক পরশু থেকেই যাবে। প্রথম প্রথম বউদির দু-বেলাই থেরাপি দরকার, পরে নয়...

নীপা বলল— আপনাকে কিন্তু কড়া হতে হবে মৃণালদা। দিদি যেন কোনো বাড়াবাড়ি না করে। ইচ্ছে হল অমনি লেংচে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল, ওটি যেন না হয়।

—প্রশ্নই আসে না। তুলি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না সম্ভাবনাটাকে— আমি মাকে সাফ বলে দিয়েছি, আপনার খুন্তি নাড়া চিরকালের মতো বন্ধ।

—দিদিকে তুমি এখনও চেনোনি তাহলে। ক-টা দিন যাক, দেখবে দিদি ফের স্বমূর্তি ধরছে। সুলতার হাতের রান্না খেতে মৃণালদার অসুবিধে হচ্ছে... থোড়-মোচা তো রাঁধতেই পারে না... পেঁপের ডালনায় গাদাগুচ্ছের মিষ্টি দেয়... আমি একটু হাত না-লাগালে...!

—আমি মাকে অ্যালাওই করব না। আজকাল মোড়ে মোড়ে বাঙালি রেস্তরাঁ। বাবার যদি তেমন কিছু খাওয়ার সাধ হয় তো, কিনে আনব।

—তোমার রাতদিনের লোকটা কি একটু-আধটু রান্না করছে?

—না না, সুলতাই তো...। নতুন মেয়েটা শুধু জলখাবার বানায়, চা-টা করে, আর টুকটাক ফাইফরমাশ। আসলে তো ওকে রাখা বাবার দেখভালের জন্য। সঙ্গে এবার মা-রটাও করবে।

খোলা মনেই হয়তো বলছে তুলি, তবে বাচনভঙ্গিটি কেন যেন কানে লাগছিল মৃণালের। স্বরে যেন বড়ো বেশি কর্তৃত্বের ছাপ। দীপার অসুখের সুবাদে সংসারের মালিকানা কি বদলে গেল? এখন থেকেই কি মৃণাল-দীপা বাতিলের দলে? অসহায় বুড়োহাবড়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃণাল ঈষৎ গোমড়া গলায় বলল— আমার হাত-পা সচল আছে তুলি। আমাকে নিয়ে না-ভাবলেও চলবে।

—সত্যি বলছেন? নীপা অমনি ঠাট্টা জুড়েছে— কিছু মনে করবেন না মৃণালদা, দিদি কিন্তু আপনাকে সারাটা জীবন স্পয়েল করেছে। সিগারেটের ছাই ঝাড়ার সময় অ্যাশট্রেটা পর্যন্ত এগিয়ে দিত। আমার বিয়ের সময় পর্যন্ত এক রাত বাপের বাড়িতে থাকেনি। কেন, না মৃণালদার কষ্ট হবে!

—একেই বলে প্রেম, বুঝেছ? ভাস্কর টিপ্পনী কাটল। মৃণালকে আলগা খোঁচা দিয়ে বলল— কেমিস্ট্রিটা কী বলুন তো দাদা? একটা বউ কী করে বরকে সারাক্ষণ চোখে হারায়?

মৃণাল হাসতে চাইল। কিন্তু হাসিটা যেন ফুটেও ফুটল না। কী করে সে ভোলে, যে সত্যিই চোখে হারায়, সে কি আইসিইউ-তে চোখ খুলে অন্য কাউকে খোঁজে।

বাবান আর ভ্বাল্টু ওপরে দীপাকে দেখতে গিয়েছিল, হন্তদন্ত পায়ে ফিরেছে। ভিজিটিং কার্ড দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বাবান বলল— কে কে যাবে চলে যাও।

নীপা ভাস্করকে বলল— চলো, আমরা ঘুরে আসি।

—কেন, মৃণালদা যাক।

উঁহু। নার্সিং হোমের শেষের ক্ষণটুকু মৃণালদার জন্যই থাক।

ফিচেল হেসে ওপরে গেল নীপা-ভাস্কর। তুলির ঠোঁটেও চোরা ঝিলিক। মৃণাল অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি বাবানকে বলল— কাল কখন রিলিজ হচ্ছে?

—ন-টায় তো আসতে বলল। হিসেব-টিসেব আছে, বিল-টিল মেটাতে হবে...

তমাল জিজ্ঞেস করল— টোটাল কত হল রে বাবান?

—মিটার ভালোই চড়েছে। ওষুধ-ইঞ্জেকশন-টান মিলিয়ে প্রায় সওয়া দু-লাখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তোর অফিস তো কিছু দেবে?

—আমার হলে পুরোটাই পেতাম। ডিপেন্ডেন্টদের একটা লিমিট আছে। ওয়ান ল্যাখ।

নির্ভরশীল শব্দটা আবার কানে বেজেছে। মৃণাল বিরস মুখে বলল—তোকে তো বলেছিলাম, টাকা আমি তুলে দিচ্ছি। আমার যে নেই, তা তো নয়।

—ছাড়ো না বাবা। হয়ে তো গেল। বাবান কাঁধ ঝাঁকাল— তোমার সঞ্চয়টুকু থাক না।

এবারও হেলাফেলার ভাব! মৃণাল আহত গলায় বলল— ব্যাঙ্কে পড়ে থাকা খুদকুঁড়ো তো বিপদ-আপদের জন্যই বাবান! আমার আর তোর মা-র।

—হেব্বি ডায়লগ দিলে তো! বাবান হাসছে। হাত উলটে বলল—করো না খরচা, কে বাধা দিচ্ছে! এখনও তো পালা সাঙ্গ হয়নি। বাড়িতে ফিজিয়োথেরাপিস্ট নেবে পার সিটিং দেড়শো। প্লাস, দু-বেলা দুটো আয়া। তার মাথা পিছু এক-শো সওয়া-শো। অর্থাৎ ডেলি মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড। এরপর আছে রোজকার মেডিসিন। যোগফলটা বুঝছ? মিনিমাম মাসে পনেরো হাজার। একা টানতে পারবে তো?

উপহাস করছে কি বাবান? নাকি যাচাই করছে বাবার ক্ষমতার দৌড়?

মৃণাল মলিন হাসল। এখন থেকে কত কিছুই তো তাকে একাই টানতে হবে। সঙ্গে টাকার বোঝা খুব বেশি ভারী হবে কি?

শাশুড়িকে ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে, শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে তুলি। রাতের আহার সেরে মৃণাল ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সিগারেট খাচ্ছিল একটা। মনে মনে ভাবছিল, এই বদ অভ্যেসটা এবার ছেড়ে দিলে কেমন হয়! এক দীপার অসুখেই সংসারের ভরকেন্দ্র বদলে গিয়েছে, এরপর সে বিছানায় পড়লে, না-জানি কী আতান্তরটাই ঘটে!

ঘরে মৃদু শব্দ। তড়িঘড়ি সিগারেট নিভিয়ে ভিতরে এসে মৃণাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখল, দীপা উঠে বসার চেষ্টা করছে। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল— কী, ঘুমোওনি?

—ঘুম আসছে না। অনেক দিন পর নিজের বিছানায় ফিরলাম তো। দীপা মৃদু হাসল— একটু বাথরুম যাব।

—দাঁড়াও। ধরছি।

সাবধানে দীপাকে উঠিয়ে বসাল মৃণাল। কাঁধে বেড় দিয়ে দাঁড় করাল। মৃণালের শরীরে ভর দিয়েই দীপা গেল বাথরুমে। ফিরে বিছানায় বসে হাঁপাচ্ছে।

মৃণাল আলগা স্বরে বলল— তুমি কিন্তু এখনও খুব উইক। রাতের আয়াটা রাখা উচিত ছিল।

—না না, এই তো শোব, উঠব সেই সকালে। অযথা পয়সা নষ্ট। দীপার ঠোঁটে চিলতে হাসি— আর দরকার হলে রাতের আয়াগিরিটুকু তো তুমিই করে দিতে পারবে।

মৃণাল কিছু বলল না। দেখছে দীপাকে। চেহারায় দিব্যি ভরভরন্ত ভাব ছিল দীপার, দুম করে যেন অনেকটা ঝরে গিয়েছে। নার্সিং হোমে ততটা খেয়াল করেনি, কণ্ঠার হাড় দুটোও বড়ো প্রকট। গায়ের রংটাও কেমন মরা মরা।

দীপা চোখ পিটপিট করল— কী দেখছ বলো তো?

—তুমি সত্যিই বড্ড কাহিল হয়েছ।

—কোন সেরিব্রালের পেশেন্ট হাসপাতাল থেকে নাদুসনুদুস হয়ে ফেরে মশাই। একে ওই বিচ্ছিরি পরিবেশ, তার ওপর অখাদ্য খাওয়াদাওয়া...

—কেন, খারাপ কী! মৃণাল অল্প হাসল— বাড়ি এসে তো নার্সিং হোমের খাবারই দিব্যি খেলে!

—উঁহু, গিললাম। আলুনি চিকেন স্টু আর শুকনো শুকনো টোস্ট!

—গেরোয় পড়লে সবই সইতে হয়।

—তুমিও এবার নোলাটা কমাও। হালকা হালকা খাওয়া অভ্যেস করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হুম। আস্তে আস্তে অনেক অভ্যেসই বদলাতে হবে। যেমন, সিগারেটটা এবার ছাড়বই।

—হুঁহ্! তোমার দম আমার জানা আছে। দীপা বিচিত্র মুখভঙ্গি করল। ধীরে ধীরে কাত হয়ে মাথা রাখছে বালিশে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলল বার কয়েক। খানিক থিতু হয়ে বলল— ভাগ্যিস আমার মতো একটা বউ জুটেছিল, তাই তরে গেলে। নইলে যে তোমার কী দশা হত!

কথাটা প্রায় লব্‌জের মতো। মাঝে মাঝেই বলে দীপা। কারণে, অকারণে। অন্য সময় হলে গায়ে মাখে না মৃণাল, আজ কোথায় যেন বিঁধল। ফস করে বলে উঠেছে— তুমিও কিছু খারাপ বর পাওনি।

—বটেই তো। এমন আলসে, হুকুমবাজ, জিভসর্বস্ব...

—তাও তো নেশাড়ু দুশ্চরিত্র নই। বলব না-বলব না করেও মৃণালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— সুজয়টার মতো।

বেজায় চমকেছে দীপা। ধন্দমাখা স্বরে বলল— সুজয়! সে এল কোত্থেকে?

—অ্যাক্টিং কোরো না। সব জানি। জ্ঞান হবার পর যেভাবে সুজয়কে খুঁজছিলে!

—আমি? সুজয়কে খুঁজছিলাম? কী যা-তা বকছ? তার মুখখানাও আমার আর মনে নেই! বেঁচে আছে, না মরে গিয়েছে, তাও জানি না। তা ছাড়া তাকে খামোকা কেন...!

দীপার স্বরে এতটুকু সংকোচ নেই। গ্লানি তো নেইই। মৃণাল থমকে গেল। দীপার চোখে চোখ রেখে বলল— আমি যে শুনলাম... তুমি সুজয়কে ডাকছিলে...

—সত্যিই তুমি বুড়ো হচ্ছ। ভীমরতি ধরছে। বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে মৃণালকে ছুঁল দীপা। ক্ষীণ গলায় বলল— এতকাল পরেও তুমি সুজয়কে...! ইস, আমি ভাবতেই পারি না।

মৃণালের মনে তবু সংশয়। কার অবচেতনে তাহলে ছিল সুজয়? দীপার? না তার? অথবা দুজনেরই?

নাকি প্রতিটি ভালোবাসার মাঝে এক ফালি সুজয় থেকেই যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপার ওপার

আবার বাস, এক ঘণ্টা পর হাতিপোতা না হাতিখেদা কী এক স্টপেজে অবতরণ, সেখান থেকে রিকশা ধরে অবশেষে এই বেসরকারি অরণ্যনিবাস। ষাট ছুঁই ছুঁই বয়েসে এই অনন্ত এই অনন্ত ছোটাছুটি আর পোষায়? আগে আন্দাজ করতে পারলে সুতপা এখানে থোড়াই আসতে রাজি হত।

রাঘবের অবশ্য কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এই ধরনের বিদঘুটে স্পটই তার বেশি পছন্দ। সঙ্গ দেওয়ার জন্যে রিটায়ার করার আগে অফিসের বন্ধুবান্ধবরা ছিল, এখন আর তাদের পায় না বড়ো একটা। বয়েস তো হয়েছে, রাঘবের মতো টগবগে জোয়ানপানা তারা কতদিন চালাবে? এখন তাই সুতপার ওপরই ভর করেছে রাঘব। গত বছর জোর করে মুণ্ডমারায় নিয়ে গেল। দু-রাত্তির খোলা আকাশের নীচে তাঁবুতে থাকতে হল সুতপাকে। কী আতান্তর, কী আতান্তর। রাঘব তো দিব্যি বোতল খুলে বসে গেছে, এ দিকে সুতপা ঠান্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড়। অথচ বিরক্তি প্রকাশ করার জো নেই, ওমনি মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে সাহেবের।

তা সেই সাহেব এখন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে বনবাংলোর চতুর্দিক। শাল-মহুয়ায় ঘেরা রীতিমতো ঘন জঙ্গল। শীতের সূর্য ঝিমিয়ে এসেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নরম আলো বিছিয়ে আছে ঈষৎ ধূসর হয়ে আসা সবজেটে কম্পাউন্ডে।

সপ্রশংস গলায় রাঘব বলে উঠল, জায়গাটা দারুণ না?

সুতপা এ দিক ও দিক তাকানোর মুড নেই। তারিফের তো নেইই। বেজার মুখে বলল, এখন কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি প্রকৃতি গিলবে? নাকি ঘরটরের বন্দোবস্ত হবে?

—অ্যারেঞ্জমেন্ট তো হয়েই আছে। রুম তো বুক করেই এসেছি। রাঘব গলা ওঠাল, অ্যাই, কোই হ্যায়? হাঁকডাক শুনে এক মাঝবয়েসি লোক বেরিয়ে এসেছে। পরনে খাকি প্যান্ট আর বুশশার্টের ওপর রংজ্বলা হাফ সোয়েটার। কাগজপত্র দেখে নিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটা খুলে দিল। চাবি রাঘবকে ধরিয়ে দিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন চা-কফি কিছু খাবেন তো স্যার?

—দুরকম ব্যবস্থাই আছে নাকি? বাহ্, বাহ্। রাঘব চোখ নাচাল, আগে তা হলে কফিই...

—না না, আমি চা খাব। সুতপা ঘরে ঢুকে খাটে বসে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, চায়ে দুধ চাই না। স্রেফ লিকার।

—এই তো ফ্যাকড়া শুরু করলে। রাঘব হালকা সুরে লোকটাকে বলল, পারো তো লাল চা?

—হ্যাঁ স্যার।

—রান্নাবান্নাও কি তুমি করো?

—আমি সবই করি স্যার। শুধু ঝাড়ুটা লাগাই না। আলাদা লোক আছে।

—অ। তুমিই ম্যানেজার, তুমিই রাঁধুনি! বেশ, বেশ। তার তোমার নামটা কী বাপু?

—আজ্ঞে ভরত। ভরত মাহাতো।

—বাড়ি কোথায়? এখানেই?

—কাছেই। লোধাসুলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আসা-যাওয়া করো?

—না স্যার। চব্বিশ ঘণ্টাই থাকতে হয়। মালিক কোয়ার্টার দিয়েছে। ওই পিছনটায়।

—বউ-বাচ্চা কি কোয়ার্টারে? নাকি লোধাসুলি?

—এখানেই আছে। ছেলে ঝাড়গ্রাম কলেজে পড়ছে।

—গুড। ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। তা কী নিয়ে পড়ে?

উচ্ছ্বসিত রাঘব প্রশ্ন হেনেই চলেছে। সুতপা ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছিল। অসহিষ্ণুভাবে বলল, ওর ঠিকুজিকুষ্ঠি কি এখনই না জানলেই নয়? ছেড়ে দাও না, চা-টা করে আনুক।

রাঘব থামতে বাধ্য হল বটে, তবে খুশি হল না। ভরত সরে যেতে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নতা ফুটেছে গলায়, ওরকম খিঁচিয়ে উঠলে কেন? ভালো করেও তো বলা যায়।

সুতপার বলতে ইচ্ছা হল, ভালো ভাষা তুমি যেন কত বোঝো! বলল না। এক্ষুনি কোনো বাদবিতণ্ডায় যাওয়ার স্পৃহা নেই। ভেতরের ঝাঁঝ যথাসম্ভব চেপে রেখে বলল, আমার শরীর আর চলছে না। একটুখানি রেস্ট নিতে দাও।

—নাও না রেস্ট। কে বারণ করেছে!

—কানের কাছে বকবক করলে বিশ্রাম হয়?

সুতপা ছোটো স্যুটকেসটা খাটের ওপর তুলল। চেন খুলতে খুলতে বলল, এসেছ তো এক দু-দিনের জন্যে। ওই লোকটার হাঁড়ির খবর নিয়ে তোমার হবেটা কী?

—স্ট্রেঞ্জ! নতুন একটা জায়গায় এলাম, সেখানকার মানুষজনকে জানব না?

সুতপা আর জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। তোয়ালে কাঁধে চলে গেছে বাথরুমে। তোয়ালে কাঁধে চলে গেছে বাথরুমে। ছোট্ট বাথরুম, তবে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। কমোডও আছে। এই ব্যবস্থাটায় ক্লান্তি যেন খানিকটা উবে গেল সুতপার। হাঁটু-কোমরের ব্যথার জন্যে রাঘবকে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে বছর তিনেক হল বাড়ির বাথরুমে বিলিতি সিস্টেম করে নিয়েছে। অভ্যেসটা এখন এমন পর্যায়ে, কোথায় গিয়ে দিশি টয়লেট দেখলে কান্না পায়।

মুখেচোখে অল্প জল ছিটিয়ে তোয়ালে চেপে চেপে করে ভালো করে মুছল সুতপা। বেরিয়ে এসে দেখল, রাঘব নেই। একটু ফাঁক পেয়েই চরকি খেতে গেছে নির্ঘাত। মানুষটা পারেও বটে। চৌষট্টি পেরিয়ে গেল, এখনও কোত্থেকে যে এত এনার্জি আসে!

এখন কাপড়চোপড় বদলানোর প্রশ্নই নেই। বাতাসে রীতিমতো শিরশিরে ভাব, চামড়া টানছে। গালে কপালে ক্রিম বুলিয়ে নিয়ে সুতপা গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। ডানলোপিলোর শয্যা, বেশ নরম। বালিশে মাথা ঠেকাতেই জড়িয়ে এল চোখ। তবে তন্দ্রা অবধি এগোতে পারল না, তার আগেই ফিরে এসেছে রাঘব। সঙ্গে ভরত, চা-বিস্কুট সমেত। উঠে বসল সুতপা, চুমুক দিচ্ছে কাপে। আস্তে আস্তে কাটছে স্নায়ুর জড়তা। রাঘবের পেয়ালা নিমেষে শেষ। হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল, কী গো, এবার খানিকটা ফ্রেশ তো?

সুতপার মনমেজাজও খানিক সমে। পালটা লঘু সুরে বলল, তা বলে ধেইধেই করে নাচতে পারব না।

—অতটা লাগবে না। রাঘব ফিকফিক হাসছে, তবে একটু বেরতে হবে যে।

—এখনই? কোথায়?

—এখনই তো বেরনোর সময়। ভরতের কাছ থেকে টিপস নিয়ে এলাম, বুঝলে। কাছে একটা নদী আছে। দারুণ ভিউ পয়েন্ট। ওখানে শেষ বিকেলে যা লাগবে না...

—আমার আর ক্ষমতা নেই। তুমি ঘুরে এসো।

—আরে, তুমিও পারবে। কিটস থেকে পুঁচকে ডিজিটাল ক্যামেরাটা বার করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রাঘব বলল, কী, বিকেলে ঘরে পড়ে থাকবে! চলো না টুক টুক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমায় ছেড়ে দাও। একটু শুয়ে নিই। হাঁটু-কোমরটা ছাড়ুক।

—আমি তো মাত্র আজ আর কাল। তার মধ্যে একটা গোটা বিকেল নষ্ট করবে? ওঠো ওঠো, ভালো করে গায়ে শাল জড়িয়ে নাও। অগত্যা সুতপাকে উঠতেই হয়। যা নাছোড়বান্দা লোক, কানের কাছে অবিরাম ঘ্যানঘ্যান করে যাবে। যেন এক্ষুনি সুতপাকে নদী দেখাতে না পারলে রাঘবের এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই মাটি। সুতপার ইচ্ছে আছে কি নেই, শরীর আর পারছে না, তাতে রাঘবের ভারী বয়েই গেল। কম দিন তো সুতপা দেখছে না মানুষটাকে, নয় নয় করে তেত্রিশ বছর। চিরকাল একইরকম রয়ে গেল রাঘব। সর্বদাই যেন নিজস্ব ঘোরে, নিজস্ব ভুবনে। ষাঁড়ের মতো হাঁই হাঁই করে অফিস আর সুযোগ পেলেই খ্যাপার মতো এ দিক সে দিক বেড়ানো, ব্যস; এর বাইরে যেন জগতে আর কিস্যু নেই। ছেলে মানুষ করা, তার স্কুল-পড়াশুনো-টিউটর, শ্বশুর শাশুড়ি যদ্দিন ছিলেন তাঁদের দেখভাল, সংসারের হাজারো খুঁটিনাটি সামাল দেওয়া, লৌকিকতা, সামাজিকতা... সমস্ত কিছুর দায় যেন সুতপার। একার। নরম-সরম কাঁধ পেয়ে ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি একটা ফুরফুরে জীবন কাটিয়ে দিল রাঘব। এখন, এই বয়েসে পৌঁছে, রাঘব যে বদলাবে, এমন আশা করাটাও তো সুতপার মূর্খামি। শুধু শাল নয়, সুতপা একটা স্কার্ফও নিল সঙ্গে। শীত এখনও তেমন জাঁকিয়ে পড়েনি, তবু বছরের এই সময়টাতেই দুম করে ঠান্ডা লেগে যায়। বিশেষত গলায়। কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে মোরাম বিছানো রাস্তা ধরল। অলস পায়ে হাঁটছে, রাঘবের পাশে পাশে। দিনের আলো মরে এসেছে, অথচ সন্ধে এখনও বেশ খানিকটা দূরে— এই সময়টা যে কী আজব। অকারণ একটা বিষাদ চারিয়ে যায় বুকে, তবে সেই মনখারাপেও কেমন সুখ সুখ গন্ধ। সুতপার মন্দ লাগছিল না অনুভূতিটা। দু পাশের ধ্যানস্থ শালগাছগুলোর গায়ে ডুবুডুবু সূর্যের আলো, পথেও এক মায়াবী আবছায়া। সুতপার ভিতরের গুমোট ভাবটা কেটে যাচ্ছিল।

রাঘব পটাপট ক্যামেরার শাটার টিপছে। এলোমেলো। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কী গো, এখন কেমন লাগছে জঙ্গল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতপা বলল, ঠিকই আছে। তবে বড্ড নির্জন।

—ভিড়ভাট্টা থাকলে কি ভালো লাগত? জঙ্গলের চার্মটাই নষ্ট হয়ে যেত না?

—তা বলে কোথাও কোনো জনমনিষ্যি নেই...

—একদম নেই কে বলল? আমাদের ভরত তো আছে। উইথ ফ্যামিলি।

সুতপা ভুরু কুঁচকে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, আমাদের বাংলোয় আর কেউ নেই, না? শুধু আমরা দু জন?

—ভয় করছে নাকি? রগুড়ে রগুড়ে গলায় বলল, এই সব ফরেস্ট বাংলোয় কিন্তু ভূতটুতও থাকে।

—ফাজলামি রাখো। কেউ কোথাও নেই মনে হলে আমার কেমন গা ছমছম করে।

—কই, আমার তো করে না!

—তুমি বীরপুরুষ, আমি ভিতু মানুষ।

—আহা, চটছ কেন? রাঘব হেসে ফেলল। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, আছে, আরও লোক আছে। বরত বলছিল বাংলোয় আর এক সেট স্যর আর ম্যাডাম এসেছে।

—কোথায় তারা? দেখলাম না তো!

—বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। হয়তো নদীর ধারেই পেয়ে যাব।

অত দূর যেতে হল না, তার আগেই দর্শন মিলেছে। সুতপা দেখতে পেল শালবন ভেদ করে হেঁটে আসছে দুই মূর্তি। দু জনেরই পরনে জিনস। ছেলেটা গায়ে জ্যাকেট চড়িয়েছে, মেয়েটা স্রেফ টিশার্ট। ছেলেটার হাত মেয়েটার কাঁধে, মেয়েটাও বেষ্টন করে আছে সঙ্গীর কোমর। অতি নিবিষ্টভাবে কথা বলছে দুজনে। মোরাম রাস্তায় উঠে সুতপাদের পাশ দিয়েছ চলে গেল, তাদের উপস্থিতি যেন গ্রাহ্যই করল না।

সুতপা ঘুরে ঘুরে দেখছিল ছেলে-মেয়ে দুটোকে। মুখভঙ্গি করে বলল, এরাই সেই স্যর আর ম্যাডাম নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

অন্ধকার নামলে জঙ্গলে আর কিছুই করার নেই। হয় ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শোনো, নয় বিছানায় গড়াগড়ি খাও। ঘরে একা বসে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল সুতপার। কথা বললে তাও সময় কাটে, কিন্তু রাঘব আবার টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে। তার তো ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ, কাঁহা কাঁহা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! ঘরে টিভি নেই, সুতপা যে বই-ম্যাগাজিন উলটোবে সে উপায়ও নেই। নামকা ওয়াস্তে বিজলিবাতি জ্বলছে বটে, তবে ভোল্টেজ অত্যন্ত কম। দুটো পাতায় চোখ বোলালে দু ঘণ্টা মাথা ধরে থাকবে। সাধে কি সুতপা এই সব বনজঙ্গলে আসতে চায় না!

বিরস মুখে রাতের ওষুধপত্রগুলো গোছাতে বসল সুতপা। পারতপক্ষে সে ব্যথার বড়ি খায় না, ভীষণ অম্বল হয়ে যায়, কিন্তু আজ একটা লাগবেই। বিকেলে হাঁটতে গিয়ে আরও যেন বেড়ে গেছে যন্ত্রণাটা। রাঘব বলল নদী নাকি কাছেই, অথচ প্রায় এক কিলোমিটার যেতে হল। দেখতেও পেল না তেমন কিছু, ততক্ষণে বেশ ঘোর আঁধার নেমে গেছে। লাভের মধ্যে লাভ, অ্যান্টাসিড গিলেও রাতভর বুক-গলা টক হয়ে থাকবে।

নিজের ওষুধের সঙ্গে রাঘবের ট্যাবলেট দুটোও টেবিলে রাখল সুতপা। এমনি অসুখ-বিসুখ নেই রাঘবের, তবে সম্প্রতি কিডনিতে একটা ছোটো স্টোন ধরা পড়েছে। তা অপারেশনে বীরপুরুষের বেজায় ভয়, ডাক্তারবন্ধুর পরামর্শ মতো বড়ি গিলছে রোজ। সঙ্গে গেলাস গেলাস জল। ওতেই নাকি পাথর বেরিয়ে যাবে।

ট্যাবলেট-ক্যাপসুল সাজিয়ে রেখে ফের বিছানায় এসে বসেছে সুতপা, হুড়মুড়িয়ে ঢুকল রাঘব। মাফলার খুলে খাটে ছুড়ে দিয়ে বলল, আকাশটা যা ফ্যান্টাস্টিক লাগছে না... অমাবস্যা তো, তারায় তারায় ছয়লাপ। দেখে আসবে নাকি?

—রক্ষে করো। আমি আর ঘর ছেড়ে বেরচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ভালো সিন মিস করলে। রাঘব চেয়ার টেনে বসল, পকোড়া খাবে তো? ভরতকে বলেছি, এক্ষুনি দিয়ে যাবে।

—ওতো আমার জন্যে নয়। সুতপার স্বরে ঈষৎ শ্লেষ, এবার বোতল খুলবে বলেই তো অর্ডার দিয়ে এলে।

—আহা, আমি একাই সব খাব নাকি? হাত বাড়িয়ে টর্চখানা টেবিলে রাখল রাঘব। দু-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন, তারপর উঠে গিয়ে বার করেছে হুইস্কির বোতলটা। নিজেই গ্লাস টানল, নিজেই ঢালল, নিজেই জল মেশাচ্ছে। মুখ তুলে বলল, চানাচুর-টানাচুর কিছু নিয়েছিলে?

—আমার তো নেওয়ার কথা নয়।

—তা হলে নেই। রাঘব হাত উলটোল। গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল, সেই স্যর আর ম্যাডামের সঙ্গে তো আলাপ হল।

—তারা এখনও বাইরে ঘুরছে বুঝি?

—নাহ। আমিই ওদের রুমে গিয়েছিলাম। রাঘব চোখ টিপল, দ্যাবাদেবী তো বেশ জমিয়ে বসেছে। দিব্যি বোতল-টোতল খুলে...

—মেয়েটাও খাচ্ছে?

—আজকাল মেয়েরাই বেশি খায়। হাঁসের মতো টানে।... আমাকেও অফার করেছিল। না না থ্যাঙ্ক ইউ বলে কাটিয়ে এসেছি।

—বাঁচিয়েছ। তোমার যা সেন্স, ওইটুকুটুকু বাচ্চাদের সঙ্গেই হয়তো আসর জমাতে বসে গেলে!

—খুব বাচ্চা নয়। থার্ড অ্যানিভার্সারি করতে এসেছে এখানে। তখন বুঝতে পারিনি, সামনাসামনি দেখে মনে হল আমাদের টুকুনের বয়েসিই হবে। বলতে বলতে হঠাৎই থমকেছে রাঘব, অ্যাই, তুমি নাকি টুকানকে বলেছ ফেব্রুয়ারি মার্চে আমরা হায়দ্রাবাদ যাব?

—টুকানের কাছে? কই, না তো।

—তবে টুকান যে আমাকে...

—তোমার ছেলে আমাদের যেতে বলছে। তবে আমি এখনও হ্যাঁ-না কিছু বলিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতপার গলায় সামান্য উষ্মা ফুটেছে হঠাৎ, কেন যাব? ওর বউয়ের বাচ্চা হবে বলে আয়া খাটতে?

পলক চুপ থেকে রাঘব হো হো হেসে উঠেছে, ধুৎ, ওভাবে ধরছ কেন? বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সময়ে সিনিয়র কেউ থাকলে ছেলেমেয়েরা ভরসা পায়।

—শুধু বাচ্চা হওয়ার সময়েই বড়োদের দরকার, তাই না? নিজের পছন্দমতো বউ পছন্দ করা যায়, সানাইয়ের পোঁ বন্ধ হতে-না-হতে আলাদা থাকার ধান্দা করা যায়, বাপ-মাকে ফেলে টুকুস করে কেটে পড়া যায়...

—এ সব তো তোমার অভিমানের কথা। ছেলের ওপর ওভারপজেসিভনেস।

কথাটা ছ্যাঁক করে গায়ে লাগল সুতপার। গুম মেরে বসে রইল একটুক্ষণ। হ্যাঁ, ছেলের ওপর তার একটু বাড়তি অধিকারবোধ আছে বটে, কিন্তু সে তো অকারণে নয়। কী না করেছে সুতপা ছেলের জন্যে? আজ যে টুকান একটা শক্তপোক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়েছে, তার পিছনে সুতপার অবদানই তো সব চেয়ে বেশি। ছেলে হওয়ার আগে সেই যে স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিল, আর ধরলই না, তা কি নিজের কথা ভেবে? টুকানের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসেবে যেতে চায় না সুতপা, কিন্তু প্রতিদান তো কিছু আশা করতেই পারে। মঞ্জিরাকে সুতপার একটুও পছন্দ হয়নি জেনেও কি থমকেছিল টুকান? স্রেফ ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখাল। কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে যে উঠে পড়ে লেগেছে, সেটা পর্যন্ত সুতপাকে জানতে দেয়নি। এখন এই শুকনো কেজো আহ্বান তো নিছক অপমানের শামিল। নয় কি?

ভরত গরম গরম পকোড়া রেখে গেছে। রাঘব প্লেটখানা এগিয়ে দিল, 'নাও, তোলো।'

সুতপা হাত বাড়াল না। ভার গলায় বলল, 'ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঘব চোখ কুঁচকে দেখল সুতপাকে। হেসে বলল, কেন মেজাজ খারাপ করছ, তপু? বি রিজনেবল। ছেলে লায়েক হলে তার ওপর আর বাবা-মার খবরদারি চলে না। ছেলের সংসার এখন ছেলেরই সংসার। আমরা মাঝে মাঝে যাব, দু-চার দিন হইহল্লা করব, নাতি-নাতনি হলে তাদের একটু আহ্লাদ দেব, ব্যস, আমাদের জব ইজ ওভার।

রাঘবের পক্ষে এরকমটা ভাবা যে কী সহজ। যে কোনো দিন সংসারের জল গায়েই মাখল না, তারই বোধ হয় এ সব কথা সাজে। কোথায়, হৃদয়ের কোন বিন্দুতে যে কষ্ট তা বেঁধে সুতপাকে, রাঘবের তা বোঝার সাধ্যই নেই। সুতপার ভাবতে মাঝে মাঝে অবাক লাগে। একটা মানুষ যে তাকে কোনো দিন অনুভবই করতে পারল না, অথচ তারই সঙ্গে টানা তেত্রিশ বছর সে এক বিছানায় কাটিয়ে দিল? বিয়ের সময়ে কী যে ছাতার মাথা মন্ত্রগুলো পড়া হয়?

রাঘব আবার গ্লাস ভরে নিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে সোফায় গিয়ে বসল। আয়েসি ভঙ্গিতে পা তুলে দিয়েছে সেন্টার টেবিলে। কচর কচর চিবচ্ছে চিকেন পকোড়া। দাঁতের ফাঁকে আটকেছে মুরগির টুকরো, হাঁ করে খুঁটে খুঁটে বার করছে।

কী তামসিক দৃশ্য! সুতপা নেমে পড়ল বিছানা থেকে। দরজা খুলে বারান্দায় এসেছে। এর মধ্যেই বাইরেটা রীতিমতো কনকনে। শালে কান-মাথা ঢেকে সুতপা বসল বেতের চেয়ারে। গেটের বড়ো আলোটা জ্বলছে না, সামনে এক ঘুরঘুট্টি আঁধার।

একটু একটু করে অন্ধকারটা সয়ে এল চোখে। তারার আলোয় দেখা যায় শালের মিছিল। আবছা। আবছা।

হঠাৎই এক খিলখিল হাসি। সুতপা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। একটু যেন টলোমলো। ঝরনার মতো হাসতে হাসতে বারান্দা ছেড়ে সামনের খোলা চত্বরটায় নেমে গেল। বেরিয়ে পড়েছে ছেলেটাও। বারান্দা থেকে চেঁচাল, হেই বেবি, ওখানে কেন? রুমে এসো। আবার হেসে উঠল মেয়ে, আমার আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কেন কী হল?

—তুমি খুব বোর করছ।

—ওকে আই উইল কিপ মাম। বাইরে থেকো না. ঠান্ডা লেগে যাবে।

—কচু হবে। আমি এখন এখানে নাচব।

—মানে?

—বললাম তো। আমার আইপডটা এনে দাও। গান শুনব আর নাচব।

—কী পাগলামি হচ্ছে?

—পাগল তো পাগল। তাতে তোমার কী? বলেই মেয়েটা বোঁ করে এক পাক ঘুরে নিল। একটু থেমে আবার দুলছে আপন মনে। দু হাত মেলে দিল ঊর্ধ্বপানে, দোলাচ্ছে কোমর।

সুতপা চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছিল। মেয়েটা কি তাকে লক্ষ করেনি? নাকি দেখেও উপেক্ষা করছে? সুতপা কি বসবে? না উঠে যাবে? সরে যাওয়াই হয়তো উচিত এখন। কিন্তু সুতপা কেন যেন নড়তে পারছিল না। একদৃষ্টে দেখছে মেয়েটাকে। আরও দু-চার বার ডাকাডাকি করে ছেলেটা ঘরে গেল। মেয়েটার হেলদোল নেই, নেচেই চলেছে। আপন খেয়ালে। একটু পরে থামল মেয়ে। ঈষৎ স্খলিত পায়ে ফিরল ঘরে। নাচটা সুতপার চোখে লেগেই রইল। এক আধিভৌতিক দৃশ্যের মতো।

তিন

দিনটাকে পুরো ছকে রেখেছিল রাঘব। সকালে জলখাবার সেরে জঙ্গলে বিচরণ, দুপুরে পেট ঠেসে খেয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুম, বিকেলে চা-বিস্কুট সাঁটিয়ে ফের নদী, সন্ধেয় যথারীতি ভাজাভাজি সহযোগে মদ্যপান। রুটিন মোতাবেকই দিন শুরু করেছিল সুতপা। নটা নাগাদ বেরোল রাঘবের পিছু পিছু। ঝকঝকে দিনের আলোয় জঙ্গলটাকে আর তেমন ঘন লাগছে না। হরিণ-টরিনের দেখা মিলবে, এমন আশাও কম। হঠাৎ হঠাৎ নাকি হাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে পড়তে পারে, এটুকুই যা রোমাঞ্চ। বনে পাখপাখালি আছে বটে, তবে চোখ টানার মতো কিছু নয়।

মোটের ওপর জঙ্গলটা তেমন আহামরি মনে হচ্ছিল না সুতপার। রাঘবের সঙ্গে বেশিক্ষণ হাঁটাও তো দুষ্কর। সে কখনো রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে ঢুকে যায়— কখনো ডাইনে। পথচলতি স্থানীয় লোকের দেখা পেলে তো কথাই নেই, দাঁড়িয়ে আলাপ জুড়ে দিচ্ছে। অঞ্চলের মানুষজনকে না জানলে রাঘবের বেড়ানোই নাকি সম্পূর্ণ হয় না।

ধুৎতেরি বলে সুতপা একাই ফিরল বাংলোয়। বারান্দায় উঠতে গিয়ে দেখল মেয়েটা বসে আছে বেতের চেয়ারে। পরনে নাইট স্যুট, চুল উমনো ঝুমনো, হাতে মোবাইল, কপালে মোটা মোটা ভাঁজ।

সুতপার দিকে চোখ পড়তেই ভাঁজ মিলিয়ে গেল। আলগা হাসল মেয়ে, গুড মর্নিং আন্টি।

—মর্নিং। সুতপা দাঁড়িয়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, এই বুঝি ঘুম ভাঙল?

—আমি তো তাও উঠেছি। সানির তো এখনও মাঝরাত্তির।

—সারা সকাল বিছানায় থাকলে বেড়ানোটা হবে কখন?

—আজ নো বেড়ানো। দুপুরে চলে যাচ্ছি।... আপনারা?

—কাল সকাল।

—এখানে এক-দুদিনই ভালো। তারপর তো বোর। কিছু করার নেই। কারওর সঙ্গে কনট্যাক্ট করা যায় না। হাতের মোবাইলটা দেখাল মেয়েটা, এখানে নেটওয়ার্কটা পর্যন্ত ঠিকঠাক থাকে না। এই আসছে, এই যাচ্ছে... মেয়েটার কথার সুর বেশ সহজ। সপ্রতিভ। সুতপা পাশে বসে পড়ল। মুচকি হেসে বলল, লোকজনের সঙ্গে কনট্যাক্ট করে হবেটা কী? তোমরা তো ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি করতে এসেছ।

—ম্যারেজ? মেয়েটা চোখ পিটপিট করল, আমার সঙ্গে সানির তো এখনও বিয়ে হয়নি।

—তা হলে যে-শুনলাম থার্ড অ্যানিভার্সারি?

—ওমা, আঙ্কেল তাই ভেবেছেন বুঝি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা কুলকুল হেসে উঠল, আমরা জাস্ট একসঙ্গে আছি। তিন মাস পর পর এই থাকাটা কোথাও একটা সেলিব্রেট করতে যাই। সানি ওটারই নাম দিয়েছে অ্যানিভার্সারি।

—ও। সুতপা একটু থমকে গেল। আজকাল লিভ টুগেদারের অনেক গল্প শোনে বটে, কিন্তু কোনো অবিবাহিত দম্পতির সঙ্গে এই প্রথম সরাসরি মোলাকাত। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ফস করে বলে ফেলল, তা বিয়েটা করনি কেন?

—করব হয়তো। তাড়াহুড়ো কিসের? তিনটে সেমেস্টার গেল, আর অন্তত একটা পেরোক।

বাচন ভঙ্গিতে মজা পেয়েছে সুতপা। বলল, বিয়ের ভয় পাও বুঝি?

—বলতে পারেন। সেকেন্ড ডিভোর্সের পরে খুব সাবধানে পা ফেলছি।

এবার সুতপার প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার জোগাড়। ঢোঁক গিলে বলল, তোমার দু বার ডিভোর্স হয়ে গেছে?

—তা হয়েছে বটে। মেয়েটা ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলল, প্রথমটা তো একেবারেই ইমম্যাচিওর ব্যাপার ছিল। আমিও যেমন, অর্পণও তেমন। অফিস থেকে ফিরেই দু-জনের লাঠালাঠি লেগে যেত। আট মাস পর বললাম, তুই তোর মতো থাক বাবা, আমি আমার মতো থাকি। ছাড়াছাড়ির পর আমাদের সম্পর্কটা অনেক নর্মাল হয়ে গেছে। নাউ উই আর গুড ফ্রেন্ডস।

সুতপার পেটে কৌতূহল বুড়বুড়ি কাটতে শুরু করেছে। না বলে পারল না, আর দ্বিতীয়জন?

—ওটা একটু সিরিয়াস ছিল। আই হ্যাড আ রিয়েল ক্রাশ ওভার তন্ময়। ভেবেছিলাম রিলেশনটা সারভাইভ করবে। হল না, ফেল করে গেল।

—কেন?

ইগো প্রবলেম। তন্ময় আমাকে প্রচণ্ডভাবে ডমিনেট করার চেষ্টা করত, এঁটে উঠতে পারত না। মানে আমি কোথায় কোথায় যাব, কার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতক্ষণ আড্ডা মারব, কোন পার্টিতে কী ড্রেস পরব, প্রত্যেকটা বিষয়ে ও আমাকে ডিক্টেট করতে চাইত। তাও নরমে গরমে চলছিল, আমার চাকরি চেঞ্জ করা নিয়ে ঝামেলা শুরু করতেই...। নিজের অজান্তেই বুঝি মেয়েটার গলা খানিক চড়ে গেছে, পাগল নাকি? আমার লাইফে অন্যের দখলদারি আমি কেন মেনে নেব? প্রেম মানে তো এমন কিছু গিঁট নয়, যে খোলা যাবে না। জট পড়ে গেলে সুতো কেটে দেওয়াই ভালো। ঠিক কি না?

সুতপা প্রায় বলে ফেলছিল, ঠিকই তো। কোনোক্রমে কথাটা গিলে নিল। হঠাৎই মনে হল, দখলদারি যতটা অসহ্য, বউকে 'আছে তো, থাকবেই তো' ধরে নেওয়াটাও কি কম অসহ্য নয়? দুটো যেন একই পয়সার এ পিঠ, ও পিঠ। ঔদাসীন্যও তো এক ধরনের অবজ্ঞা। নয় কি?

খানিক সময় নিয়ে সুতপা বলল, তুমি বোধ হয় একটু বেশি সেন্সেটিভ।

—কী জানি, হবে হয়তো। একটু যেন দূরমনস্ক দেখাল মেয়েটাকে। তারপর যেন আপন মনেই বলল, আমি কী রকম পার্টনার চাই জানেন? সমান সমান টাইপ। মেন্টালি। সেরিব্রালি। একজন সত্যিকারের কমরেড। উইথ প্যাশন। সে কেয়ারিং হবে, কিন্তু মাসল ফোলাবে না। আমার ওপিনিয়নকে সে ততটাই রেসপেক্ট করবে, যতটা সে নিজের মতামতকে করে।

—ওরে বাবা, তোমার তো লম্বা ফিরিস্তি গো। সুতপা শব্দ করে হেসে উঠল, এমন অর্ডারি ছেলে দুনিয়ার কোথায় মিলবে? টুপ করে ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মেয়েটা বলল, শৌনক, আই মিন সানির মধ্যে ওই সব কোয়ালিটি অনেকটাই আছে। ও আমাকে ফিল করতে পারে। আমিও যেন ওকে বুঝি।

—তুমি শিওর? সুতপার চোখ সরু হল, মাত্র ন মাস দেখেই?

—ভুল করতেই পারি। এই সম্পর্কটাও হয়তো তা হলে...। মেয়েটাকে খানিক আনমনা দেখাল। একটু পরে হাসিটা ফিরেছে। সহজ সুরে বলল, কী আর করা যাবে আন্টি? রিলেশন ছিঁড়লে মনের ওপর দিয়ে জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড় যায় বটে, তবে একটা রিলিফও তো মেলে। তার দামও কি কম?... তা ছাড়া ঠোক্কর খেতে খেতেই তো লাইফ এগোয়। ভুলভ্রান্তিগুলো বুঝতে পারি। আরও সতর্ক হই। কিন্তু মন যেখানে সায় দেয় না, সেখানে আটকে থাকাও তো আরেক যন্ত্রণা। আপনি আর আঙ্কেল নিশ্চয়ই অনেক দিন একসঙ্গে আছেন... নিশ্চয়ই ভালোই আছেন... তবু... আপনার কি মনে হয় আমি খুব যুক্তিহীন কথা বলছি?

সুতপা চট করে জবাব দিতে পারল না। ঘাড় দুলে গেল কি? কে জানে!

চার

রাতের খাবার ঘরেই দিয়ে গিয়েছিল ভরত। সাদামাটা আয়োজন। রুটি, দিশি মুরগির ঝোল আর স্যালাড। বিকেলে ভরত ডিমের চপ ভেজেছিল, লোভে পড়ে খান তিনেক খেয়ে পেট দম মেরে ছিল সুতপার। তবু খাবার ঠান্ডা করার তো মানে হয় না; একটা রুটি দিয়ে সেরে নিল নৈশাহার। ওষুধটষুধগুলো খেয়ে শুয়ে পড়েছে। রাঘব হাঁটতে বেরিয়েছিল। সামনের চত্বরটায়। খেয়ে উঠে একটু পায়চারি না করলে রাঘবের নাকি ঘুম আসে না। অভ্যেস।

ঘুম অবশ্য সুতপারও আসছিল না। কেন যেন মেয়েটাকে মনে পড়ছে বার বার। কতটুকুনিই বা পরিচয়, হাই হ্যালো করতে করতেই কী অবলীলায় নিজের জীবনকাহিনি উগরে দিল! কী বলা যায় এই মেয়েকে? বেশি অকপট? না নির্লজ্জ? তবে এমনিতে তো সিধেসরলই মনে হল। ভিতরে প্যাঁচপোঁচ থাকলে কি সুতপাকে পাত্তা দিত? না অত গল্প জুড়ত? কাঁধে রুকস্যাক বেঁধে বাই আন্টি, যাই আন্টি করে দিব্যি হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেল দু-টিতে। একটু যেন ভালোবাসার দেনাপাওনা আছে, তবে এখন তো ও সব দৃশ্য চোখসওয়া। জুটিটা টিকবে তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঘব ঘরে ফিরেছে। ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে ঢকঢক করে জল খেল অনেকটা। আলো নিবিয়ে মশারিতে ঢুকেছে। বালিশে মাথা রেখে বলল, এবার প্রচুর ছবি তোলা হয়ে গেল, বুঝলে।

—ফালতু ফালতু শাটার মেরে গেলে তো হবেই। সুতপা আলগোছে বলল, আজ সূর্যাস্তেরই তো ছবি নিলে একগাদা।

—হুম! বাড়ি গিয়েই সিডি বানিয়ে ফেলতে হবে। মেমারিটা সাফা করা দরকার।

—ধীরেসুস্থে কোরো। তাড়া কিসের?

—বা রে, যদি ফেব্রুয়ারিতে হায়দ্রাবাদ যাই...

—ফেব্রুয়ারি এখনও ঢের দেরি। তা ছাড়া যাব কি না তার তো নিশ্চয়তা নেই।

—সে কি? ছেলের বউয়ের প্রথম বাচ্চা হবে, শাশুড়ি পাশে থাকবে না?

—মঞ্জিরার মাও তো আছে, সে যাক।

—কিন্তু টুকান যে তোমাকেই চাইছে।

—থাক। কে কাকে চায়, কত চায়, কী জন্যে চায়, সব জানা আছে।

খোঁচাটা রাঘব আদৌ বুঝল কি? তবে একটুক্ষণ নীরব। তারপর অন্ধকারে স্বর ফুটেছে, যথেষ্ট রেসপন্সেবল ছেলে, নিজের মতো করে শান্তিতে ঘরসংসার করছে, মোটেই আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো ওরা উড়নচণ্ডী নয়...। দেখলে তো দু-খানা স্যাম্পেল।

—টুকানরা টুকানদের মতো। ওরা ওদের মতো। সব্বাই কি এক ছাঁচে ঢালা হবে নাকি?

—তা হয়তো নয়। তবে তুমি যাই বলো, ওদের লাইফস্টাইলটা মোটেই অ্যাপ্রিশিয়েট করা যায় না। অকারণে সমস্যা বাড়াচ্ছে।

—কেন?

—একসঙ্গে থাকার অন্য হ্যাপাটা নেই? একটা বাচ্চাকাচ্চা এসে গেলে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—এরা অত অসাবধানি নয়। নিশ্চয়ই ব্যবস্থাট্যাবস্থা...।

—তবু... মেয়েটা আজ হোক কাল হোক ছেলেমেয়ে একটা কিছু চাইতেই পারে। আর যদি আদৌ সেই বাসনা না থাকে, তা হলে তো বলতে হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এও এক ধরনের অসুস্থতা।

—না না, ইচ্ছে আছে। আমাকে বলছিল।

—তা এরকম ভেসে ভেসে বেড়ালে বাচ্চা মানুষ করবে কী করে?

—তার আগে নিশ্চয়ই থিতু হয়ে যাবে।

—কী জানি, আমি এদের ঠিক বুঝতে পারি না। বাচ্চাকাচ্চা হলে তাদেরই কপাল খারাপ।

—কেন?

—এমন ছাড়া ছাড়া অ্যাটিটিউড নিয়ে কি সন্তান মানুষ করা যায়? এদের যা কেয়ার ফ্রি লাইফ, মনে হয় না ছেলেপুলের সঙ্গে কোনো অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হবে।

কথাটা সুতপার বুকে কোথায় যেন বাজল। সে তো ছেলে নিয়েই সম্পৃক্ত ছিল, টুকান ছাড়া কিচ্ছু জানত না, তাতেই কি টুকান তার খুব আপন হয়েছে? নিয়মরক্ষার খাতিরে ফোন করে, দূর থেকে শৌখিন আহা-উহু দেখায়, কিন্তু আদতে সুতপার ওপর টুকানের কতটুকু টান? যেটুকু আছে, সেটুকু তো ওই মেয়েটিও পাবে তা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে, নয় কি?

ঠান্ডা বাড়ছে অল্প অল্প। কম্বলটা গলা অবধি টেনে নিল সুতপা। পাশ ফিরে শুয়েছে, ফের রাঘব বলল, তুমি বললে মেয়েটা খুব জলি?

—তাই তো দেখলাম।

—আমার মনে হয় ওটা শো। যে ধরনের লাইফ ও লিড করছে, তাতে আনন্দ থাকতে পারেই না। ভেবে দেখো, একটা সম্পর্কও দানা বাঁধছে না, তার আগেই ঘ্যাচাং ফু... এ মোটেই সুখের ব্যাপার নয়।

—অর্থাৎ মেয়েটা খুব দুঃখী?

—হতেই হবে। তুমি নিজেকে ওর জায়গায় প্লেস করে দেখো, মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে জীবনটা একটা বিভীষিকা। এর চেয়ে আমরা বাবা ঢের ভালো ছিলাম। আছিও। কী সুন্দর তরতর করে সংসারের পানসিটা বয়ে গেল।

রাঘবের কথাগুলো ঠাট্টার মতো শোনাল কি? সুতপা কি সত্যিই খুব সুখে ছিল। আছে? পানাপুকুর, না দিশেহারা বহে চলা, কোনটা যে ভালো?

সুতপা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎই বড্ড শীত করছিল সুতপার।

—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম মামার বাড়ি ভাগলপুরে ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (ইংরাজি ১০ জানুয়ারি ১৯৫০)। পিত্রালয় বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ছোটোবেলা থেকে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা। প্রথম থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ। সত্তর দশক থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে থাকেন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, বিশেষ করে নারীদের অবহেলা এবং মানসিক যন্ত্রণার কথা। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে দহন, কাছের মানুষ, কাচের দেওয়াল, হেমন্তের পাখি অন্যতম। দহন উপন্যাসের জন্য কর্নাটকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে তিনি পেয়েছেন নন্‌জনাগুড়ু থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার। এ ছাড়া আরও অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

লালমাটি